এস ও এস

আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

চিন্তিত দেখাচ্ছে ডিনসমেডকে....2
কনভেন্ট স্কুল....35
কলেজের সামনে....74
স্থানীয় থানার অফিসার....104
আধময়লা জামাকাপড় 128
আতঙ্কের চিহ্ন 161

চিন্তিত দেখাচ্ছে ডিনসমেডকে

০১.

কদিন ধরেই একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে ডিনসমেডকে। সে ভেবে ভেবে যেন সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে না। কিন্তু কদিনের মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এইভাবে ঠিক ভালো লাগে না। অথচ আগেই কথাটা আবার সুসানকে বলতে চায় না। তবে সে ব্যাপারটা স্থির করে তবেই স্ত্রীকে জানাবে।

চিন্তিত হয়ে প্রায় সাতটায় ডিনসমেড বাড়ি ফিরল। শীতের সময় ঠান্ডাটা বেশ উপাদেয়। শীতের শুরুটা বেশ মনোরম। তারপর বাড়ি ফিরে যদি ফায়ার প্লেসের সামনে এক কাপ গরম কফি নিয়ে বসা যায় তাহলে তো কথাই নেই।

অবশ্য অন্যদিন ডিনসমেড আটটা; সাড়ে আটটায় বাড়ি ফেরে। তিনতলা বাড়িটায় তার। অ্যাপার্টমেন্টটা দোতলায়। ডিনসমেড সিঁড়ি বেয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টটার কাছে দাঁড়ায়। বাড়িটা তিন বছরের পুরোনো।

তা বছর দশেক ডিনসমেড এ অঞ্চলে আছে। ভাড়া একটু বেশি হলেও শহরের একদম কাছে বলেই এই অ্যাপার্টমেন্টটা তার দেখামাত্র পছন্দ হয়েছিল। আশেপাশে সবকিছু পাওয়া যায়। তখন তার সংসারটা ছোটো আর ব্যাবসাও উন্নতির পথে জোরকদমে এগোচ্ছে। তারপর সংসারও বাড়ল আর সহসা ব্যবসায় ভাটা নেমে এলো, এবং এখনও তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

হঠাৎ একটা গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে ডিনসমেড সম্বিৎ ফিরে পায়। তারপর সে একটু চমকে উঠে কলিং বেল পুশ করে।

সুসান ডিনারের তদারক করছিল। কলিং বেলের শব্দে ন্যাপকিনে হাত মুছে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দরজা খুলে অবাক হয়ে সুসান বলে, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরলে?

–হ্যাঁ, চলে এলাম। অফিসে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না।

এসে ভালোই করেছ।

–একটু কফি কর তো।

করছি।

তারপর কফির কাপ হাতে নিয়ে সুসান বলে, এই ঘণ্টাখানেক আগে রজার আবার এসেছিল।

এসে কি বলল?

–বলল, তুমি যদি দয়া করে তার সঙ্গে একটু কথা বলো তাহলে সে খুশী হবে।

–খুশী হবে? বিনয়ের অবতার। কথার মারপ্যাঁচ বোঝে না।

–ভাবটা তাই দেখাচ্ছে।

–দেখবে ও এখুনি আমায় আবার ফোন করবে।

–তুমি কীসে বুঝলে? স্বামীর হাতে কফির কাপটা দেয়।

–ইদানিং ও আমার আসা যাওয়ার ওপর নজর রাখে।

ডিনসমেড কফিটা তখনো শেষ করেনি টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠলো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডিনসমেড রিসিভারটা তুলে, হ্যালো।

–হ্যালো, ডিনসমেড, এখন আপনাকে ফোন করে বিরক্ত করছি না তো?

–আদৌ নয়।

–ধন্যবাদ, আমার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করলেন?

–হ্যাঁ, অন্য বাড়ির চেষ্টায় আছি।

সুসান ইঙ্গিতে জানায় যে, এখানে যে ভাড়ায় আছে অন্য কোনো জায়গায় সেই ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যাবে না। ডিনসমেড মাথা নেড়ে সুসানকে হাসতে বারণ করে।

-তা অবশ্য ঠিক। তবু আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।

–হ্যাঁ, আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

–কিন্তু তেমন তো কোনো গরজ দেখছি না।

–আমি দালালকে পর্যন্ত বলেছি সেও আমায় অপেক্ষা করতে বলেছে।

–ও, তা আপনি কার সঙ্গে কথা বলেছেন?

–পিটারের সঙ্গে। আপনি তাকে চেনেন নাকি?

–চিনি বই কি। ঠিক আছে কিন্তু আমি ওকে বলতে চাইনি।

–কেন? বললে ভালো হবে মনে হয়।

–তাহলে আমার কাছেও দালালি চাইবে তবু বলব।

–এই করেই তো ওদের চলে।

–আমার ছেলে মাস চারেকের মধ্যেই এসে পড়বে বলেই আপনাকে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। একতলার সব দোকানদারকে বলতে তার ফল হাতেনাতেই পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই তারা নেই নেই করে উঠেছে। ওদিকে আমার ছেলের আসার সময় হয়ে গেছে। সে তো

পাঁচ সাত মাস থাকবেই। এই কমাসের জন্য ব্যবস্থা করতে পারছি না। অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া অবশ্য সমস্যার ব্যাপার।

–আমার ক্ষেত্রেও একই কথা।

–বুঝি। গুড নাইট।

–গুড নাইট।

.

০২.

বন্ধু রবার্টের বাড়ি যাবার জন্য ডিনসমেড সকালের দিকেই বেরিয়ে পড়ল। আধঘণ্টার মধ্যে ডিনসমেড একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। এরই একটা অ্যাপার্টমেন্টে রবার্ট থাকে।

স্কুলের গণ্ডি তারা একসঙ্গেই পেরিয়েছে। তারপর একজন যায় সাহিত্য আর অন্যজন বিজ্ঞানের দিকে। রবার্ট বরাবরই পড়াশোনায় ভালো থাকার জন্য দুজনের মধ্যে রেষারেষি ছিল।

এখন মিঃ রবার্ট একটা ব্যাঙ্কে উচ্চপদস্থ অফিসার। তিরিশ বছর বয়সে বিয়ে করে সে সুখেই ছিল। তাদের একটা কন্যাসন্তান জন্মায়, ফুলের মতো সুন্দর মেয়ে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী

দুজনেই খুব খুশী। ছুটিছাটায় দুজনেই মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এত সুখ আর সইল না। কারণ তার স্ত্রী হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যায়।

স্ত্রীর খবরটা অফিসে বসে পেয়ে যখন রবার্ট সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফেরে তখন সব শেষ।

ডিনসমেড খবরটা শুনে ছুটে এসে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে, তার স্ত্রীর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেছে। আর শিশুকন্যার ভার তুলে দিয়েছে সুসানের হাতে।

মাসখানেক বাদে ডিনসমেড বাড়ি নিয়ে এখানে এসেছে। ওখানে মেয়ে ভালোই আছে।

বাবা মেয়েকে পেয়ে খুশী হতে পারল না কারণ মেয়েই মাকে দূরে পাঠিয়েছে। এখন মেয়েই তার কাল।

রবার্ট একথা বিশ্বাস করে না। মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে। আবার কী খেয়ালে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। কাদলে তাকায় না। তখন জোন্স মেয়েকে সামলায়। সাহেবের হাবভাব না বুঝে একটু দেখে সে চলে যায়। মেয়ে বায়না করে বাবার কাছে যাবে বলে। মেয়েকে সামলাতে পারে না। আপনি অথবা মিসেস ডিনসমেডকে পাঠিয়ে দেন, মেয়েকে আদর ও খেলনা, খাবার নিয়ে আসতে।

ডিনসমেড যেতে একটা কারণে, সে হল মিস জুলিয়েট। তার প্রতি তার একটা দুর্বলতা ছিল। আবার রবার্টের স্ত্রী লিজা, বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যও বলা চলে।

মেয়ে আর জোন্স-এর দারুণ ভাব হয়েছে। একে অপরকে ছাড়া চলে না।

দরজার বেল টিপতেই জোন্স এসে দরজা খুলে বলে, গুড মর্নিং।

চল্লিশ বছরের জোন্স, মজবুত স্বাস্থ্য, এবাড়িতে বছর দুই কাজ করছে। এখানেই নাকি প্রথম কাজ করছে।

ফিসফিসিয়ে ওঠে জোন্স, স্যার, আপনি সাহেবকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আপনাকে সাহেবকে রাজী করাতেই হবে।

–আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না।

–আমার কথা যেন আবার বলবেন না।

–শোন, মিস জুলিয়েটের খবর কী?

–উনি নিয়মিত পড়াতে আসছেন।

–ভালো, আচ্ছা দুজনে কেমন গল্পগুজব করছে?

–বেশি নয়।

–বেশি নয়! এটা তো ঠিক না। আমি তো অনেক কিছু আশা করেছিলাম।

-স্যার আমিও তাই, তবে বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছি। সাহেব যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। একটু হেসে কথাও বলে না। মেমসাহেব চলে গিয়েই যত বিপদ বাঁধিয়েছে।

–তা ঠিকই। আর মিস জুলিয়েট?

–সে কিছুটা সহজ। হাসিমুখে জোন্স বলে, কিন্তু স্যার, আমি..

.–কিন্তু আবার কি?

–আমি আপনার উপরই...।

–সে তো আমি আছিই কিন্তু জানো তো মেয়েদের হাতে অনেক গোপন অস্ত্র আছে।

–তবু আপনাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে স্যার।

–দেখা যাক কী করা যায়।

এদিকে মেয়ে হাজির। তাকে নিয়ে যাবার আগে জোন্স বলে–আপনি এগিয়ে যান স্যার।

অ্যাপার্টমেন্টের প্রথমে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় মোটা কার্পেট দিয়ে ঘেরা, সম্ভবত ইজিপসিয়ান।

তারপরই বৈঠকখানায় বেশ কিছু চেয়ার, দু-একটা ল্যান্ডস্কেপ। যা দৃষ্টি কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট।

একটু পরেই রবার্ট এলো–পুরুষালী চেহারা, ছফুট উচ্চতা, চল্লিশের নিচে বয়স।

–তা ডিনসমেড খবর কী?

—ভালো, তুমি কেমন আছো?

ভালো আছি। রবার্টের যেন উদাস ভাব।

–আমার তা মনে হয় না।

–তা না হবার কারণ কী?

–কারণ তো আছে নিশ্চয় বন্ধু, ভালো আছি কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারলে না। কথাটার মাঝে যেন একটা...

–উঁহু ঠিকভাবেই বলেছি।

–মিথ্যে কথা আমি বলছি না। ভালো কথাটার মাঝে যেন একটা বিষাদের সুর ঝরে পড়ছে।

–বিষাদের? কিসে বুঝলে?

–ফ্যামিলিম্যানের চোখে অনেক কিছুই ধরা পড়ে যায়।

–ও। রবার্ট এই বলেই চুপ করে থাকে। কী বলবে বুঝতে পারে না।

–হ্যাঁ, ভালো কথা। মেয়ে তো একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে।

–হ্যাঁ, অস্বীকার করার উপায় নেই।

-ওর পড়াশোনার কী ব্যবস্থা করছ?

–ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। জোন্স তো আছে আর একজন টিচার দিয়েছি।

–ছেলে না মেয়ে?

–মেয়ে, কাছেই থাকে।

–ভালোই করেছ। আমার ছেলে-মেয়ের জন্যও রাখতে হবে। জোগাড় করলে কোত্থেকে?

–আমার অফিসের এক কলিগ জোগাড় করে দিয়েছে। রবার্ট যা ভেবেছিল ঠিক তাই, ডিনসমেড জাল বিছিয়ে দিল।

কলিগ? তা বয়স কত?

–জানি না।

–বেরসিকের মতো কথা বলো না তো।

–এতে বেরসিকের কী আছে? মেয়েদের বয়স চট করে বোঝা যায় না।

ডিনসমেড নাছোড়বান্দা–না গেলেও আন্দাজেই বলল ওর বয়স কত?

-চব্বিশ পঁচিশ হয়তো হবে।

মিস না মিসেস?

রবার্ট ডিনসমেডের কথার ধরন বুঝতে পারে। মিস।

–এ মাস থেকে?

–হ্যাঁ, কিন্তু মিসট্রেসের ব্যাপারে হঠাৎ তুমি এত আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন?

–একটু আলাপ করার জন্য। তাও তোমার জন্য।

–সে উপকার তোমায় করতে হবে না।

–মেয়েকে নিয়ে রাখার সময় তো সেকথা বলনি।

–আরে না, কথাটা তুমি অন্যভাবে নিও না।

–না, বলছিলাম কি বিয়ে করো।

–এ বয়সে আর বিয়ে না।

–আজকালকার দিনে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বয়স কী বেশি? এ বয়সে অনেকেই প্রথম জীবন শুরু করে।

–আমার আপত্তি আছে।

–কীসের?

–আমার বিবেকের কাছে।

–কিন্তু কেন সেটাই তো আমি জানতে চাইছি।

–লিজাকে আমি ভুলতে পারছি না।

–কিন্তু রবার্ট লিজা তো আর ফিরবে না। কিন্তু তোমার কামনা বাসনা বলে তো কিছু আছে।

–সত্যি বিশ্বাস করো ওসব আমি ভাবি না।

–কিন্তু মেয়েটার ভবিষ্যৎ বলেও তো একটা জিনিস আছে।

–ওর ব্যাপারে আমার কোনো চিন্তা নেই ও দিব্যি জোন্সের সঙ্গে মেতে উঠেছে।

–সেটাই সব নয়। ওর বাবা-মায়ের স্নেহ ভালোবাসার প্রয়োজন। যা সবাই চায় এই শিশুকালে।

–ও আমার কাছে সেটা পায়।

-মোটেই পায় না। তুমি সকালে অফিসে বেরিয়ে যাও ফের সেই রাতে। তখন মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর জেগে থাকলেও সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তোমার পক্ষে মেয়েকে আদর করা সম্ভব না, তখন দরকার হয় নিজের বিশ্রামের।

–কথাটা ভুল নয়।

–তাই আমার কথাটা একটু ভেবে দেখ।

ততক্ষণে জোন্স কফি ও খাবার নিয়ে হাজির। মিঃ ডিনসমেডকে সে ইঙ্গিত করল। ডিনসমেড কফিতে চুমুক দিয়ে বলল

–তখন তুমি বিবেকের কথা বলছিলে না?

–হ্যাঁ।

–কিন্তু তুমি তো লিজাকে ডিভোর্স করে বিয়ে করছ না। লিজা অকালে মারা গেছে বলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে থাকা চলে না কারণ তোমার মেয়ে এখনও শিশু।

–আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু...

–কিন্তু করো না তো।

–আমায় ভাববার একটু সময় দাও।

–এ নিয়ে এ কথা কবার বললে?

–এবার ভেবে ঠিক বলব।

–কিন্তু আমার মন বলছে এবার বলবে তোমার কথা একেবারে ভুলে গেছি।

–এবার তা হবে না।

–না হলেই খুশী হবো। ঠিক আছে উঠি।

.

০৩.

একেবারে আচমকা ঘটনাটা ঘটল। ডিনসমেড ভাবতেও পারেনি জোন্স অফিসে তাকে ফোন করবে।

-হ্যালো, ডিনসমেড? আমি জোন্স বলছি।

–বলো কী খবর? তোমার সাহেবকে রাজী করাতে পারলে?

–আর রাজী। সাহেব এখন সবকিছুর বাইরে।

–মানে?

–সাহেব আজ দুপুরে ট্রেন থেকে পড়ে গেছে। মিনিট পাঁচেক আগে পুলিশ ঘটনাটা জানিয়ে গেছে।

তারা তোমার সাহেবকে চিনলো কী করে, যে রবার্টই সেই মানুষ?

-সাহেবের পকেটে আইডেনটিটি কার্ড ছিল। উঃ সাহেব নেই ভাবতেও পারছি না। সাহেবকে ওরা মর্গে নিয়ে গেছে।

-জোন্স দয়া করে চুপ করো।

–স্যার, আমি একা মর্গে যেতে পারব না। আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

–আমায় মর্গে গিয়ে রবার্টের মৃতদেহ দেখতে অনুরোধ করো না জোন্স।

–কিন্তু স্যার, আমি একা সাহস পাচ্ছি না।

–অগত্যা। এইভাবে আমিও একদিন পুট করে চলে যেতে পারি।

–স্যার ওকথা বলবেন না।

–বলতে তো চাই না। তবু ঘটনাগুলো তো আমাদের ভরসায় বসে না থেকে নিষ্ঠুরভাবে ঘটে যায়।

–আপনি আসছেন তো স্যার?

–হ্যাঁ, বাচ্চাটা কী করছে? তুমি জুলিয়েটকে একবার ফোন করে দাও।

–ও টি.ভি. দেখছে।

–অবোধ শিশু, জানতেও পারল না যে জীবনের শেষ অবলম্বনটুকু ও আজ হারালো।

–আপনি তো আছেন।

–আর আমি। ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে কিছু বলেছে?

–বলেছিল। আমার ঠিক মনে নেই।

–ঠিক আছে আমি আসছি। মিস জুলিয়েটকে খবরটা দিয়ে দাও।

–হ্যালো।

–হ্যালো, ডিনসমেড বলছি।

–বল, আমি সুসান।

–একটা বাজে খবর আছে। রবার্ট মারা গেছে।

–মিঃ রবার্ট? আমি তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

–আজ দুপুরে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।

–ওমা সেকি! এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষ...তোমায় ঘটনাটা কে বলল?

–জোন্স।

–সত্যিই কী দুর্ঘটনা, না অন্য কিছু?

–হঠাৎ তোমার মনে এমন কথা এল কেন?

–রবার্ট একটা সুস্থ সবল মানুষ। এভাবে

–রবার্ট অসুখে মারা যায়নি। গেছে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে।

–তা হোক, আমার মনে কিন্তু খটকা লাগছে।

–এতে খটকার কী আছে?

–কিন্তু নিউজে তো বলল না?

–সব ঘটনাই কী নিউজে বলে?

–তা ঠিক। তবু তুমি একটু ভালো করে খোঁজ নাও।

–জানো সুসান, আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে। আত্মহত্যা করল না তো?

–না না, তা সে করবে কেন?

–না, ওর মনের অবস্থা তো ভালো ছিল না।

–মানছি, কিন্তু ওর মেয়েকে কে দেখবে?

–জোন্স দেখছে। মেয়েটা কতক্ষণ বা রবার্টকে পেত তাই জোন্সকে আঁকড়ে ধরেছে। দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসে। জোন্স তো মেয়েটার জন্য পাগল। মেয়েটাও জোন্স নেওটা হয়েছে।

–এটা একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। হা, তুমি আত্মহত্যার কথা বলছিলে কেন?

–রবার্ট লিজাকে ভুলতে পারছিল না। হয়তো সেই কারণে।

–তা বলে আত্মহত্যা করবে কেন?....

–আমার মনে হল বলে বললাম। আমি ওকে বহুবার বিয়ের কথা বলে পেয়েছি একই উত্তর। আর বিয়ে নয়। তারপর আনমনে কি সব ভাবত।

–আসলে ও লিজাকে খুব ভালোবাসত। ছুটির দিনে দুটিকে এক জায়গায় দেখা যেতো।

–তা মনে হয় স্ত্রীর শোক সামলাতে না পেরে এমন কাণ্ড করে বসেছে।

–তোমার কথাটা একেবারে ফেলনা নয়।

–শোন, আমায় মর্গে যেতে হবে। ফিরতে একটু রাত হবে।

–ঠিক আছে, হয়ে গেলেই চলে এসো।

.

-হ্যালো,

–হ্যালো, আমি রবার্টের বাড়ি থেকে জোন্স বলছি। মিস জুলিয়েটকে দিন না।

–ও, একটু ধরো।

–হ্যালো, মিস জুলিয়েট?

-হ্যাঁ। আজ সকালে যেতে পারিনি বলে খুবই লজ্জিত। বাড়িতে কয়েকজন গেস্ট এসে গিয়েছিল। কাল সকালে ঠিক যাবো।

-না না, আমি তার জন্য ফোন করিনি।

–ও বুঝেছি। ছোট্টসোনা বুঝি অভিমান করেছে?

কথাটা যেন জোন্সের গলার কাছে আটকে আছে।

সাহেব নেই।

–কী সব আজে-বাজে কথা বলছ?

আজে-বাজে নয় মেমসাহেব।

–আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তা উনি মারা গেলেন কীসে?

–ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে। মেমসাহেব আপনি দয়া করে মর্গে যেতে পারবেন?

–যাবো।

–এক্ষুনি চলে আসুন।

–আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেডকে খবর দিয়েছ? উনি কি বললেন?

–দারুণভাবে মুষড়ে পড়লেন। আপনার মতো উনিও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেনি।

–কী করে পারবেন? এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

–এখন ভাবছি মেমসাহেব চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে। উনি ছিলেন নরম স্বভাবের। উনি এ শোক সহ্য করতে পারতেন না।

–ঠিকই বলেছ। তা বাচ্চাটা এখন কি করছে?

–এতক্ষণ টি.ভি. দেখছিল। এখন খেলা করছে।

–এখন তুমি আর মিঃ ডিনসমেড ছাড়া হতভাগা শিশুটার আর কেউ রইল না।

–হ্যাঁ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আপনি তাহলে তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

–ঠিক আছে।

.

০৪.

রবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ। বিমর্ষ জুলিয়েটকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে জোন্সকে রবার্টের বাড়িতে পৌঁছাতে রবার্টের অ্যাপার্টমেন্টে গেলেন।

জোন্স এর মধ্যে একবার ডিনসমেডকে ডেকে গেছে। বিমর্ষ ডিনসমেড সোফায় বসে আছে। পাশের বাড়ি থেকে ঘুমন্ত বাচ্চাকে এনে জোন্স বিছানায় শুইয়ে দিল।

রাত নটা, বাড়ি যাবার জন্য ডিনসমেডের তাড়া নেই। তার বুকটা খালি হয়ে গেছে।

জোন্স কিছু স্যান্ডউইচ ও পানীয় এনেছে। স্যার।

–অ্যাঁ।

–আপনার জন্য একটু হুইস্কি আর...

–হ্যাঁ দাও। রবার্ট আমাকে এইভাবে নিঃসঙ্গ করে চলে গেল।

-সাহেব নেই তা যেন এখনো ভাবতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখুনি আসবেন।

ডিনসমেড হুইস্কির গ্লাসটা টেনে নেয়। আর ফিরবেন। তোমার সঙ্গে তার আলাপ তিন বছরের আর আমার সঙ্গে স্কুল জীবন থেকে। কলেজ আলাদা হলেও আমাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি আজ যা ধরিয়ে দিল। বাচ্চাটা এখন কী করছে?

-ঘুমোচ্ছ।

–এরপর মনে হয় ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে।

–হ্যাঁ, কিছুটা তো পড়তেই হবে।

ও সমানে সাহেবের কথা জানতে চাইছে।

–সে তো চাইবেই। ওরা যে পরম করুণাময় ঈশ্বরের..ওঃ হ্যাঁ, তা ও কী বলছে?

–বলছে বাবা বাইরে গেছে।

ডিনসমেড শান্তভাবে পানীয়ে চুমুক দিতে থাকে।

–এরপর বলল, চল আমরা গিয়ে বাবাকে ডেকে আনি।

–এইভাবে কদিন কাটবে মিথ্যে বলে?

–তাই ভাবছি। এই বাড়িটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

–কি করবে এবার?

–এখান থেকে চলে যাবো।

–কোথায়?

–যে কোনো জায়গায়। এছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না।

–শান্ত হও জোন্স।

-স্যার, আমি আজ সাহেবের অভাব ভালোভাবে টের পাচ্ছি। আর...অল্প বয়সে মা-বাবা মরা এই মেয়েটার দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। উঃ কী ভাগ্যই না এই মেয়ের। এই বাড়িটা এতো নির্জন হয়ে গেছে যে আমায় গিলতে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

সবাই ভবিতব্য। ভেবে আর কী করবে?

-ভাবনার হাত থেকে কারো মুক্তি নেই, আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমি ঠিক এখান থেকে চলে যাবো।

–কিন্তু একটা জায়গা তো ঠিক করতেই হবে।

–আমায় এখান থেকে চলে যেতেই হবে। আমার গ্রামেই ফিরে যাবো।

–এখানকার অ্যাপার্টমেন্ট?

–তা তো ভাবিনি।

—ওসব চিন্তা ভুলে যাও।

–অ্যাপার্টমেন্ট বেচে দেব। ফার্নিচারগুলোও।

–তা নয় হল। কিন্তু মেয়েকে গ্রামে নিয়ে কী করবে?

–ওখানে ওকে মানুষ করবো।

–ওখানে ভালো লেখাপড়া হবে না।

–কেন ওখানে কত ছেলে-মেয়ে স্কুল কলেজে লেখাপড়া করছে না।

–তা পড়বে না কেন? জোন্স ভুলে যেও না, ও হল রবার্টের মেয়ে। এত উচ্চ বংশের সন্তান।

–ওর জন্য আমি ভালো মাস্টার রাখব।

–তা নয় দিলে। কিন্তু বাড়িতে কে দেখাশোনা করবে?

–কেন আমি।

–আমি সেই দেখাশোনার কথা বলছি না। বাড়িতে ওকে পড়াশোনায় সাহায্য করা দরকার।

–এটা তো ভাবিনি। ঠিক আছে তাহলে ওর জন্য একজন গভর্নেস রেখে দেবো।

–তাকে তো অনেক মাইনে দিতে হবে।

–আমি উদয়াস্ত খেটে সেই টাকা জোগাড় করবো। সেরা স্কুলে পড়াবো মানে কোনো দিক দিয়েই আমার ত্রুটি থাকবে না।

–মানি। তাছাড়া তুমি বাচ্চাকে ভালোও বাস। তবে আমি বলি কি আমায় দাও ওর ভার।

–না না, সেটা অসম্ভব। ও আপনার কাছে কিছুতে থাকতে পারবে না।

–ঠিক পারবে। লিজা মারা যাবার পর বেশ কিছুদিন তো ও আমার কাছেই ছিল।

–তা ছিল। তখন ও একদম শিশু, এখন বোধশক্তি হয়েছে। পাশের বাড়িতে যে কিছুক্ষণ ছিল তাতেই আমার কথা বলে কেঁদে দিয়েছে।

-বাচ্চারা ওরকম করে। কদিন যেতে না যেতেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

–না স্যার, ও আমায় কখনই ভুলবে না।

–আমার কাছে রেখেই দেখ না। আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে ও ভালোই থাকবে। তুমি বিয়ে-থা করোনি সংসারের কোনো বালাই নেই।

-না স্যার, দয়া করে আমায় ও হুকুম করবেন না।

–হুকুম না জোন্স, বন্ধুর প্রতি আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে।

–তা নিশ্চয়ই আছে।

–আমি এ ব্যাপারে মিস জুলিয়েটের সঙ্গে কথা বলেছি।

–তিনি কী বলেছেন?

তিনি বলেছেন বাচ্চা আমার কাছে রাখাই সব দিক দিয়ে ভালো। তোমার সাথেও তিনি কথা বলবেন।

-ও, আমায় একটু ভাববার সময় দিন।

–ঠিক আছে মন ঠিক করার জন্য দিন কয়েক সময় নাও।

–আপনি আবার আসবেন?

–এ সপ্তাহে আর হবে না।

–ঠিক আছে।

–অর্থাৎ তোমায় ভাববার জন্য দশদিন সময় দিচ্ছি।

–আপনার অসীম করুণা স্যার।

–তাহলে আজ উঠি।

–আসুন স্যার।

.

০৫.

সাড়ে দশটায় ডিনসমেড বাড়ি ফিরে সুসানকে বলল–সব কাজ ভালোভাবে হয়ে গেছে।

-তোমারও খুব ধকল গেছে।

–একটা কথা ভাবছি। তাতে মনে হয় তোমার কোনো আপত্তি নেই। রবার্টের মেয়েকে আমাদের কাছে রাখতে চাই।

-পরের মেয়ের ভার নেবে?

–রবার্টের মেয়ে আমাদের পর হবে কেন? তাছাড়া আমরা না দেখলে কে দেখবে বল?

–তোমার মতই আমার মত।

.

–হ্যালো। আমি কি মিস জুলিয়েটের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

–বলছি।

–গুড মর্নিং, আমি ডিনসমেড বলছি।

–গুড মর্নিং, কাল ফিউনারাল থেকে কখন ফিরলেন?

–প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গেছে। শরীর ভালো আছে তবে মন ভালো নেই।

–না থাকবারই কথা। মিঃ রবার্ট শুধু আপনার বন্ধুই ছিলেন না। হিতাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন।

–হ্যাঁ, ও আমার ভাইয়ের মতো। কোনো ব্যাপারেই আমাদের মতের অমিল ছিল না।

–হ্যাঁ, মিঃ রবার্টও আমায় মাঝেমধ্যে একথা বলতেন।

–মিস জুলিয়েট, কাল রাতে আপনাকে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেই কথাগুলো আমি জোন্সকে বলেছি।

-হ্যাঁ, বাচ্চাটাকে আপনার কাছে রাখলেই বেশি ভালো হবে। তা জোন্স রাজী হয়েছে?

-বোধ হয় না, ও ভাবতে কিছুটা সময় নিয়েছে। কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে তো। সেই জন্যই...

-তবু মেয়ের কথা ভেবে ওকে আপনার কাছে রাখতে দিলেই ভালো। ভবিষ্যৎ বলে তো কিছু আছে। ও নয় প্রতি সপ্তাহে ওকে দেখতে আসবে...

-আপনি ভালো কথা বলেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।

-এতে ধন্যবাদের কী আছে? শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ছাত্রীর প্রতি আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে।

–নিশ্চয়ই তবে অনেকে তো...এবার আপনাকে একটা অনুরোধ করবো।

–বলুন।

–মানে বাচ্চা আমার কাছে থাকলে আপনাকে একটু কষ্ট করে আমার বাড়িতে যেতে হবে। আপনার বাড়ি থেকে ওটা দূরে তবে আমি চেষ্টা করবো তা পুষিয়ে দেবার।

–তবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে আমায় এটুকু করতেই হবে। আর মেয়ে যখন রবার্টের।

-এবার আমার আর কিছুই বলার নেই। আপনার বন্ধুপ্রীতি দেখে আমি মুগ্ধ। আর আমিও সত্যি কথা বলতে ওকে পড়াতে চাইও।

-এতেই বোঝা যাচ্ছে আপনি বাচ্চাকে সত্যিই ভালোবাসেন।

–মা-বাবা হারা শিশু। তবে একদিকে সৌভাগ্য বলতে হবে। মিঃ রবার্ট আপনার মতো বন্ধু পেয়েছিল। যার থেকে তার মেয়েও বঞ্চিত হবে না।

কাজের চাপে ডিনসমেডের জোন্সের কাছেও যাওয়া হল না। সুসান বলল–কই জোন্সের কাছে গেলে না তো?

-এই সপ্তাহে যাবো। তবে মেয়ে দেবে বলে মনে হয় না।

–একবার চেষ্টা করেই দেখ না। না দিলে কীই বা করবে?

–দেখি আজ যদি যেতে পারি। এর মাঝে তো দশদিন চলে গেছে। তা তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

যাবার তো ইচ্ছা আছে কিন্তু বাচ্চা সামলাবে কে? তুমি একাই যাও।

অগত্যা ডিনসমেড একাই চকলেট, বিস্কুট আর কিছু খেলনা নিয়ে গাড়িতে উঠে রওনা হল রবার্টের বাড়ির উদ্দেশ্যে। দশমিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল।

নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়ায় ডিনসমেড, দেখে দরজায় তালা। সে ভাবল জোন্স হয়তো বাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়েছে একটু বাদেই ফিরবে।

মিনিট দশ পার হয়ে গেছে। ডিনসমেড একটা সিগারেট ধরায়, এইভাবে তিনটে সিগারেট শেষ হয় তবু জোন্সের দেখা নেই।

এক ঘণ্টা পর ডিনসমেডের কেমন একটা সন্দেহ হতে লাগল। তার মনে হতে লাগল বাচ্চাটার কিছু হল কী না; বাচ্চাটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল না কী? বাচ্চাটার কিছু হলে তার আফশোসের সীমা থাকবে না।

আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর একতলায় মিস হেনেসের কাছে আসে। রবার্টই আগে তার সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

কলিং বেল টিপতেই হেনেস বেরিয়ে আসে।

গুড মর্নিং মিসেস হেনেস।

–গুড মর্নিং মিঃ ডিনসমেড।

–কেমন আছেন বলুন।

–ভালো, আপনি।

চলে যাচ্ছে, জোন্স কোথায় গেছে জানেন? তালা দেওয়া দেখছি।

–জোন্সের কোনো খবর জানেন না?

–না।

-সেকি আমি তো জানি আপনি সব জানেন। জোন্স সেই কথাই বলেছিল। মিঃ হেনেসও তাই জানেন।

–ও কী বলেছে?

–ও চলে যাচ্ছে। কী যেন একটা জায়গায় নাম বলল।

–মিস হেনেস জানেন?

–না। আর জোন্স অ্যাপার্টমেন্ট বেচে চলে গেছে।

কবে? কাকে?

দিনপাঁচেক আগে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে বেচেছে।

–তিনি কোথায় থাকেন?

–শুনেছি এই শহরেরর উত্তরদিকে থাকেন। ওর মালপত্র এসে গেছে, ফ্যামিলি কাল আসবে।

-কততে বেচেছে?

–চল্লিশ হাজার টাকা।

–মাত্র?

–আমায় তো তাই বলেছে। আমি ভাবছি এসব বেচে দিল অথচ আপনি জানেন না?

–মনে পাপ থাকলে কী অপরকে জানায়? বাচ্চাকে কী করেছে জানেন?

–দেখলাম তো সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

–কিন্তু কোথায় নিয়ে গেল, দেশের বাড়িতে?

–তা আমি জানি না। জায়গাটার নাম করতে পারছি না। বলেছে বাচ্চাকে ওখানকার একটা কনভেন্টে ভর্তি করে দেবে। তারপর যা থাকে ওর কপালে।

-ঠিক আছে, চলি।

–আসুন।

কনভেন্ট স্কুল

০৬.

শহরে যে কটা কনভেন্ট স্কুল আছে, সব কটা খুঁজেও কোথাও বাচ্চার হদিশ না পেয়ে ডিনসমেড বাড়ি ফিরে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

-হ্যালো।

–হ্যালো মিস জুলিয়েট। আমি ডিনসমেড।

–বলুন মিঃ ডিনসমেত, খবর কী? বাচ্চা কেমন আছে?

বাচ্চার কোনো খবর জানি না।

-মানে, বাচ্চা এখনও নিজের কাছে আনেননি বুঝি? আপনার কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

–আমার পরের কথা শুনে আরো ঘাবড়ে যাবেন।

–তা কথাটা কী?

–জোন্স অ্যাপার্টমেন্ট সহ ফার্নিচার বেচে বাচ্চা নিয়ে উধাও।

–পালিয়েছে? জুলিয়েটের গলায় বিস্ময়ের আওয়াজ।

–হ্যাঁ।

–কিন্তু আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।

–আমার কথা শুনলেই বুঝবেন। এইমাত্র ওর ওখান থেকে এসেই আপনাকে ফোন করছি।

-কোথায় গেছে কেউ বলতে পারছে না? মিসেস হেনেসকেও কিছু বলে যায়নি?

–সে বলতে পারছে না। তাকে বলেছে বাচ্চাকে শহরের একটা কনভেন্টে দেবে।

–তাহলে দেখা মিলতে পারে।

–সেগুড়ে বালি। আমি আশেপাশের সব কনভেন্টগুলিতে খবর নিয়েছি। ও মিথ্যে কথা বলেছে।

–অথচ বাচ্চাকে আপনার কাছে দেবে বলল।

–হ্যাঁ, আমি তো তাই জন্যই আনতে গিয়েছিলাম।

তাছাড়া বাচ্চাকে মানুষ করবে কী করে? একটু ভালোভাবে মানুষ করতে গেলে চাই টাকা। সে ও পাবে কোথায়? আর তাছাড়া গাইডেন্স?

-টাকার ব্যবস্থা করেই গেছে। অ্যাপার্টমেন্ট বেচে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে।

–কাকে বেচেছে কিছু জানতে পেরেছেন?

–হ্যাঁ ম্যাকডোনাল্ড নামে এক ভদ্রলোককে। দিন পাঁচেক হল বেচেছে।

–ও।

–আমি এখন কী করি? স্ত্রী শুনলে ভীষণ আপসেট হয়ে পড়বে।

–পড়বে তো। নেহাৎ বন্ধুর মেয়ে বলেই আপনি দেখাশোনা করতে গিয়েছিলেন অথচ জানেন আমি এখনও ভাবতে পারছি না জোন্স বাচ্চাকে নিয়ে পালিয়েছে।

–আমারও এক অবস্থা।

–আমি কী থানায় যাবো?

–থানায় গিয়ে কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না।

পুলিশ ওদের খুঁজে বার করবে।

–কেমন করে?

–তাও তো বটে, ওদের ছবি তো আমার কাছে নেই। আপনার কাছে আছে?

–উঁহু, তবে একটা ডায়েরি করে রাখুন।

–তাই করি। জোন্স যে এভাবে ডোবাবে

অথচ গেলে তো কত ভালো ব্যবহার করত। কথায় কথায় চা-কফি নিয়ে আসত। আর বাচ্চার কথা বলত সবসময়। আর সেই বাচ্চার ক্ষতি করার জন্য ও উঠে পড়ে লেগেছে।

-সত্যি, বাচ্চার কথা ভেবে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

–ও বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে। আর জোন্স একসঙ্গে অত টাকা পেয়ে হয়তো বেপরোয়া জীবন শুরু করবে।

–আমারও তো একই চিন্তা আর আপনাকে যে টিচার রাখব কথা দিয়েছিলাম তাও খেলাপ হল।

–আপনি আর কী করবেন! আমার দুর্ভাগ্য এমন একটা সুন্দর বাচ্চা পড়াবার ভার পেয়েও হারালাম।

–সবই ভবিতব্য। তাহলে ছাড়ি।

–হ্যাঁ। আর কোনো খবর পেলে ফোনে জানাবেন।

–নিশ্চয়ই।

.

–হ্যালো।

–হ্যালো সুসান, আমি ডিনসমেড কথা বলছি।

–বল, এত দেরি করছ কেন?

–একটু পরেই ফিরছি।

-আর দেরি করো না। আমি ছেলে-মেয়েদের বাচ্চাটার কথা বলেছি, ওরা কেবলই ওকে দেখতে চাইছে। আমি ভুলিয়ে রেখেছি।

–সুসান খারাপ খবর আছে।

–বলল, তা খবরটা কী?

–জোন্সকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে বাচ্চাটাও।

তার মানে?

–ও বাচ্চাটাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ তা জানে না।

–তুমি থানায় খবর দিয়েছ?

–না, প্রথমেই ওরা ছবি চাইবে, তা আমার কাছে নেই। মিস জুলিয়েটও একই কথা বলেছেন।

তাকেও জানিয়েছে?

–হ্যাঁ।

মেয়েটা তাহলে এভাবে হারিয়ে যাবে?

–কী করবো বল? আমার তো কিছুই করার নেই।

–জোন্সের মেয়েটাকে নিয়ে পালানোর পিছনে কী উদ্দেশ্য আছে?

–তা ওই জানে?

–অথচ তুমি জোন্সের কত প্রশংসা করতে।

–তখন তো এমন ছিল না।

–যাক তবু একটা ডায়েরি করে এসো।

–আচ্ছা।

.

০৭.

–হ্যালো।

–হ্যালো। মিঃ ডিনসমেড বলছেন? আমি পিটার বলছি।

–বল কী খবর?

–স্যার একটা খবর আছে। হয়তো শুনে খুশী হবেন।

–তা খবরটা কী?

–স্যার একটা তৈরি বাড়ির সন্ধান পেয়েছি।

–কোথায়?

–গ্রীন উডে।

–তোমায় গ্রীন উড়ে বাড়ি দেখতে কে বলেছে? একেবারে গ্রাম।

–গ্রাম কিন্তু এমন সুন্দর বাড়ি শহরেও পাবেন না। আর পেলেও তার দাম দুই-তিন লাখ টাকা চাইবে।

-কিন্তু আমি তোমায় শহরের বাড়ির কথাই বলেছিলাম।

–আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই।

–তাই দেখো।

ডিনসমেড কথাটা বলল বটে কিন্তু শহরে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। রবার্টের চিন্তা সারাক্ষণ মনমরা করে তুলেছে। তারপর বাচ্চাটাও হারিয়ে গেল। তারপর কী মনে হওয়ায় আবার জিজ্ঞাসা করল–তা বাড়িটার দাম কত?

-ষাট হাজার টাকায় একটা পুরো বাংলো। তিনটে শোবার ঘর, কিচেন, ডাইনিং স্পেস, সামনে বাগান।

–পঞ্চাশ হলে ভালো হত।

–স্যার আপনার অফার তাকে জানাবো।

তবে গ্রামে থাকতে ঠিক মন চাইছে না।

–স্যার ওখানে কিছু অসুবিধা হবে না। সবকিছু আছে। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি।

–তা দেখেছো যখন তখন সত্যি করে বলল ওখানে কী কী সুবিধা অসুবিধা আছে?

–স্যার বাড়িয়ে বলা অধর্ম। এ শর্মা তা করে না।

–ঠিক আছে বল।

পিটার একটা লম্বা ফিরিস্তি দিল যার সুবিধা বেশি অসুবিধা নামে মাত্র।

-যাক সব শুনলাম তবু শহরই।

-তা তো ঠিক, তবে আপনি বলেছিলেন না একটু নিরিবিলি জায়গা, তাই ওখানটা খুঁজেছিলাম।

-নিরিবিলি?

– স্যার, ওখানকার মতো মুক্ত বাতাস, অদূরে পাহাড়ে, পাখির ডাক অন্য কোথাও পাবেন না। ওখানে ঠেলাঠেলি, নোংরা বাতাস-এর কিছুই এখানে নেই। স্যার রোববার বাড়িটা একবার দেখে আসবেন না?

দাঁড়াও আগে মিসেস-এর সঙ্গে কথা বলি।

–ঠিক আছে কাল আমি আবার ফোন করব।

–আচ্ছা, তা বলে শহরের বাড়ির কথা ভুলো না যেন।

–সেকি কখনও হয় স্যার? ছাড়ি স্যার।

–ঠিক আছে।

নিরিবিলি কথাটা বরাবরই তার খুব ভালো লাগে। সত্যি সে নিরিবিলিতে থাকতে চায়। একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, অথচ ডিনসমেড পিটারকে তার সঙ্গে আর বন্ধু রবার্টের বেঁচে থাকার সময় বলেছিল তার বাড়ির পাশে বন্ধুর জন্যও একটা বাড়ি খুঁজতে। যাতে তারা দুজনে আরো বেশি করে যোগাযোগ রাখতে পারে তার জন্য। এখন সেই বন্ধুর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতেই তিনি এখন থেকে পালাতে ইচ্ছুক। রবার্টকে ভুলতে সে নিজেকে সবসময় কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখে।

কিন্তু স্মৃতির হাত থেকে কারো মুক্তি নেই। সেই স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এ যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। আগে তার এক ঘুমে রাত কেটে যেত। এখন অতি কষ্টে রাতে ঘুম এলেও মাঝে ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুম আসে না। দেওয়াল ঘড়ির টিক টিক্ শব্দ তাকে যেন অনেক কিছু বলতে চায়।

শুধু তাই নয় মাঝেমধ্যে রবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্য ডিনসমেডের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন রবার্ট তাকে হাত নেড়ে ইশারা করে ডাকে এবং হাতটা বাড়িয়ে দেয়। কী বীভৎস সেই হাত! অথচ রবার্টের হাত ছিল মেয়েদের হাতের মতো সুন্দর।

এক আধদিন এই দৃশ্য দেখে সে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। সুসান তখন স্বামীকে জল খাইয়ে সুস্থির করে। এই ঘটনার পর ডিনসমেড পাত্তারি গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টায় আছে। ডিনসমেড ঠিক ভয় পায়নি। আসলে সে রবার্টকে নিয়ে এত বেশি ভাবে যে তার অবচেতন মনে এই সমস্ত দেখা দেয়। সুতরাং গ্রামের বাংলোবাড়িই শ্রেয়।

অন্যদিনের তুলনায় আজ ডিনসমেড একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে বলে সুসান খুব খুশী।

একটু পরেই সুসান কফি নিয়ে আসে। স্বামী-স্ত্রী মুখমুখি বসে কফি পান করছে। কফিতে চুমুক দিয়ে ডিনসমেড বলে–

–তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।

জরুরী? কী ব্যাপারে?

–বাড়ির।

–সত্যি এ বাড়িতে আর থাকা যায় না।

–হঠাৎ এ কথা বলছ?

–রজার লাঞ্চের পর এসেছিল। রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে গেছে।

–ওকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। ওর ছেলে আসবে।

–আমাদের অসুবিধাটা তো উপেক্ষণীয় নয়। তা তুমি কী বলছিলে যেন?

–পিটার একটা বাড়ির খোঁজ এনেছে।

–কোথায়?

–একটু গ্রামের দিকে।

–ওসব গ্রামে ফ্রামে গিয়ে থাকতে পারব না।

–কিন্তু...তোমার কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। তবু বলছিলাম...

–বল, তবে গ্রামের ব্যাপার বাদে। এতদিন শহরে থেকে তারপর গ্রামে থাকব কী করে?

–তোমার কথা ভিত্তিহীন বলে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু সুসান এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।

–এসব কথা আসে কোত্থেকে?

রবার্টের ছায়া আমায় কাছে পেতে চায়। সে সমানে আমায় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

–ওসব অলক্ষুণে কথা মনে আনবে না।

সুসান স্বামীর কথায় ভয় পেয়ে যায়। মনে পড়ে রাতের স্বপ্নের কথা।

–তোমার দিকটা যে আমি বুঝতে পারছি না তা নয়, কিন্তু..

-তোমার গ্রামে গেলে একটু অসুবিধা হবে, শহরের বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু এখানে রবার্টের হাতছানি সর্বদা আমায় তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য ওঁৎ পেতে আছে।

-না না, ওসব বলল না। বাড়িটা কোথায়?

–গ্রীন উডে।

–সে তো এখান থেকে অনেক মাইল দূরে। সেখানে স্কুল আছে তো?

–তা থাকবে না কেন? ওখানকার বাচ্চারা কী পড়াশুনা করে না?

–তা এতো বড়ো একটা বাংলোর দাম ষাট হাজার টাকা চাইছে?

–তাও আমি ষাট হাজারে রাজী হইনি, পঞ্চাশ হাজার বলেছি।

–দেখো, আর কী বলব?

–না, তোমার মত না পেলে...।

–তোমার মতই আমার মত।

–তাহলে একদিন গিয়ে বাংলোটা দেখে আসি?

–ঠিক আছে।

–আচ্ছা সামনের রবিবার যাওয়া যেতে পারে?

–হ্যাঁ তাই চলো।

.

০৮.

সুন্দর সকাল, পরিষ্কার আকাশ দেখে কে বলবে গত রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে।

চার্লস গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। উইক এন্ডে সে কোথাও না কোথাও পাড়ি জমায়। এই ঘোরাই নাকি ওকে সারা সপ্তাহের রসদ জোগায়।

চল্লিশ বছরের সুপুরুষ চার্লস লম্বায় প্রায় ছফুটের কাছাকাছি, পেশিবহুল, চওড়া কাঁধ। দুপুরের ছেঁড়া মেঘ দেখে সে ভাবছে এই মেঘ কেটে যাবে।

চার্লস একটা রেস্তরাঁর সামনে গাড়ি পার্ক করে লাঞ্চ সারে। এবং সেখানেই কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে শহরের দিকে গাড়ি নিয়ে এগোয়।

চার্লস আকাশ দেখে ভয় পেয়ে যায়। চারিদিকে রাশিকৃত কালো মেঘ তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। চার্লস দ্বিগুণ বেগে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। তারপরই যত গণ্ডগোল। সে গাড়ি থামিয়ে দেখে পথের মাঝে গাছ ভেঙে পড়ে আছে। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় অনেক কষ্টে ঘণ্টা দুয়েক পরে গাছ সরানো সম্ভব হল।

চার্লস ওদের টাকা মিটিয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভালোয় ভালোয় শহরে পৌঁছোতে পারলে হয়। একটু পরেই বৃষ্টি থামল। চার্লস ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে যায় শহরে পৌঁছোবার আশায়, নইলে সমূহ বিপদ–যা ঠান্ডা। রাস্তার দুধারে পাহাড়ের সারি। অদূরে ঘন জঙ্গল।

হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। বৃষ্টি না পড়লে কয়েক ঘন্টায় শহরে পৌঁছোবে।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় না। এবার আরো জোরে বৃষ্টি এলো।

লোকালয় থেকে চার্লস অনেক দূরে চলে এসেছে। একটা বাড়ি থেকে অপর বাড়ির দূরত্ব অনেক। আবার সন্ধে হয়ে এসেছে।

হঠাৎ ওয়াইপারটা কাজ করছে না। চার্লস হাত দিয়ে মুছে গাড়ি চালায়। বৃষ্টি হয়েই চলেছে। থামবার কোনো লক্ষণ নেই বরং বেড়েই চলেছে।

এখন পিচের রাস্তা ছেড়ে কাঁচা মাটির উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে। গাড়ির গতি না কমালে যেকোনো মুহূর্তে পিছলে পাশের গভীর খাদে পড়বে। মিনিট পাঁচেক পর চার্লসকে গাড়ি থামিয়ে দিতে হয়। জলের তোড়ে গাড়ি চলে না।

চার্লস কী করবে? বিপদ অনিবার্য। গাড়ি থেকে নেমেই বা কী করবে? কোথায়ই-বা যাবে? আশপাশে কোনো বাড়ি নেই। চারিদিকে শুধু জল আর জল। তার উপর যা হাড়কাঁপানো ঠান্ডা।

চার্লস ভাবে মরতে হলে গাড়িতে মরবে কিছুতে গাড়ি থেকে নামবে না। সীটে বসে হুইস্কির বোতলটা খুলে খানিকটা হুইস্কি খায়। এতে ঠান্ডা কিছুই কমে না। তবে খানিকটা তাজা বোধ হয়।

চার্লস গাড়িতে স্টার্ট দিলে খানিক চলার পর গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। ইঞ্জিনে জল ঢুকেছে গাড়ি আর চলবে না। এখন উপায়? চার্লস ভাবে কোথাও গাড়ি কারখানা পাওয়া যাবে? এতো বাজে আবহাওয়ায় কোনো মেকানিক কী আসতে চাইবে? মোটা টাকা দিলে আলাদা কথা।

হঠাৎ গাড়ি চলতে শুরু করে। ইঞ্জিন বন্ধ। গাড়ি জলের তোড়ে চলছে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির মডগার্ড আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে গাড়ির গতি রোধ করে। তার পর গাড়িতে একটা মোটা নাইলনের দড়ি ছিলো, তাই দিয়ে কোনোরকমে গাড়িটাকে একটা গাছের সাথে বেঁধে ওভারকোট দিয়ে মাথা ঢেকে সে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

মিনিট দশেক চলার পর সে একটা আলোর অস্পষ্ট রেখা দেখতে পায়। তার গতি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কারণ শীতে সে জমে যাচ্ছিল, একটা আশ্রয় না পেলে সে মরেই যাবে।

হ্যাঁ, চার্লস ঠিকই দেখেছে। ওটা একটা বাংলো বাড়ি। চার্লস ঘড়ির রেডিয়ামের দিকে তাকিয়ে দেখে সাতটা বাজে।

চার্লস প্রায় বাড়িটার কাছে এসে গেছে আর হাত দশেক বাকি পৌঁছোতে। ঠান্ডায় সে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

দরজার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বেলটা বাজায়, হঠাৎ বেলের শব্দে ডিনসমেড থমকে যায়। ডিনার টেবিলে বসে সে ব্যাবসাসংক্রান্ত কাগজ দেখছিল। এই ঝড়জলের রাত্রে কে বেল বাজাচ্ছে?

জর্জ তার বাবার কাছে বসে ছিল। সেও চমকে যায়। সুসান কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে বলে–বাইরে কে যেন বেল বাজাচ্ছে।

–আমারও তাই মনে হল।

–কে আবার আসতে পারে?

–না না।

–কেন মা?

বেলটা তখনই বেজে উঠল বেশ জোরে।

–মাম্মি খুলি?

–জিনসমেড বলে–কোনো অশরীরী আত্মা নয় তো?

–সে আবার কী কথা?

–হয়তো রবার্ট।

–আঙ্কেল তো মরে ভূত হয়ে গেছে। জর্জ হাসে।

হতেও তো পারে।

জর্জ দরজার দিকে এগিয়ে যায়–নিশ্চয় কেউ বিপদে পড়েছে।

তারপর জর্জ দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে–ভেতরে আসতে পারি?

–নিশ্চয়ই। আপনি যে একেবারে ভিজে গেছেন।

পথের মাঝে গাড়িটা বিগড়ে গিয়ে এই বিপত্তি।

এর মধ্যে বাবা-মার কাছে মেরী এবং শার্ট এসে হাজির। ওরা কিচেনে মায়ের সঙ্গে রান্নায় সাহায্য করছিল। মাকে ছুটে আসতে দেখে ওরা থাকতে পারেনি।

–এসে ফায়ার প্লেসের কাছে বসুন। ডিনসমেড চার্লসের দিকে এগিয়ে যায়।

চার্লসের কাঁপা থামেনি–আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

–আরে এতে ধন্যবাদের কী আছে? আজ আপনি বিপদে পড়েছেন কাল আমিও পড়তে পারি। জর্জ ততক্ষণে একটা চেয়ার নিয়ে ফায়ার প্লেসের কাছে রেখে–আপনি এতে বসুন।

-ধন্যবাদ ভাই।

–ফায়ার প্লেসের কাছে বসে গনগনে আগুনের কাছে হাত বাড়িয়ে দেয় চার্লস।

–আপনার পরিচয়টা জানা হল না।

–আমার নাম চার্লস বো ভারা।

–কোথায় থাকেন?

–পাম এভিনিউতে।

–তা এদিকে কোথায়?

–নিছক ঘুরতে। বলতে গেলে প্রায় উইক এন্ডেই বের হই।

–তাহলে ঘোরা আপনার নেশা কী বলুন?

–হ্যাঁ তা বলতে পারেন।

হঠাৎ একটা জিনিসের দিকে নজর পড়তেই সুসান বলে ওঠে-শার্লট।

শুধু নাম উচ্চারণ করতেই শার্লট দ্রুত ভেতরে চলে যায়। চার্লস ব্যাপারটা দেখল। যুবতী নারীর দিকে বারবার তাকানো যায় না।

ডিনসমেড বলে–আপনাকে একটু ব্র্যান্ডি দিতে বলি?

-তাহলে তো খুব ভালো হয়। সত্যি আপনাদের আশ্রয় না পেলে...

–কিছুই হত না। অন্য কোথাও পেতেন।

–এখানে আপনার বাড়ি ছাড়া তো অন্য কোনো বাড়ি নজরেই এলো না।

–হ্যাঁ কাছে পিঠে আর নেই।

এর মধ্যে ব্র্যান্ডি ভর্তি গ্লাস আনে মেরী-এই নিন।

পানীয় নিয়ে মেরীর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে অস্পষ্ট করে বলে–ধন্যবাদ।

চার্লস ব্র্যান্ডি পান করে কিছুটা চাঙ্গা বোধ করে।

-এই দেখুন কী ভুলো মন, আপনি এখনও ভিজে জামাকাপড়ে রয়েছেন।

–ঠিক আছে,-চার্লস সত্যিই লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে।

-তা বললে হয়? এই ভিজে জামাকাপড়ে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন আর আমিও লজ্জায় মারা যাবো। একরাত কষ্ট করে আমার জামা পরে চালান।

হঠাৎ চলে গিয়ে শার্লট আবার ফিরে এসেছে দেখে চার্লস খুশী। দুবোনের মধ্যে সেই সুন্দরী। ডিনসমেড বলে–মেরী তুমি চার্লসকে বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।

–আসুন আমার সঙ্গে।

অগত্যা মেরীকেই অনুসরণ করতে হয়।

পোশাক পাল্টে চার্লস আর ডিনসমেড ডিনার টেবিলে মুখোমুখি বসেছে।

ডিনসমেড বলল–আপনার নেশার কথা জানা গেল কিন্তু পেশার...

–পেশায় আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার।

জর্জ বলে ওঠে। জানেন আমারও ইঞ্জিনিয়ার হবার শখ।

চার্লস জর্জের দিকে তাকায়,-রোগা ছিপছিপে গড়ন, কটা চোখ, ধূসর চুল, বয়স ষোল হবে।

-ভালো কথা।

–আমি এখানে একটা ছোট্ট ল্যাবোরেটরি তৈরি করেছি।

–ভেরি গুড। যাবার সময় দেখে যাবো।

আমি পেশায় কন্ট্রাক্টর।–ডিনসমেড বলে।

–কীসের?

বাড়ির। অথচ আমার নিজের বাড়ি হল না।

–এটা?

–কিনেছি।

–আচ্ছা এখান থেকে শহর কত দূরে?

–ত্রিশ-চল্লিশ মাইল হবে।

–আপনার ছেলে কোথায় গিয়ে পড়াশোনা করে?

—এই গ্রামের শেষের দিকে স্কুল-কলেজ আছে।

-বাজার হাট?

–টিন ফুড ভরসা।

–বলেন কী?

মেরী বলে–মাংসওয়ালাই সপ্তাহে মাত্র একদিন দোকান খোলে।

-তাই নাকি?

ডিনসমেড বলে–হ্যাঁ, কে বলুন তো টিন ফুডের সৃষ্টি করেছিল? তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকা যায় না।

–ঠিক বলতে পারব না। চার্লস মেরীর দিকে তাকায়। বয়স আঠারো হবে, মাথায় একরাশ ধূসর চুল, কটা চোখ, স্লিম ফিগার, পরনের ম্যাক্সি।

ওদিকে শার্লট ও সুসান ডিনার সাজাতে ব্যস্ত। শার্লটকে একনজরে দেখে নেয়। সতেরো হবে, নীল চোখ, লম্বা ধূসর চুল, সুন্দরী।

ওরা তারপর ডিনারে বসল। কোণার রাস্তার ধারের ঘরে চার্লসের থাকার কথা হল। ডিনসমেডের কথামতো চার্লস সেই ঘরে শুতে গেছে। তাকে সবকিছু দেখিয়ে দেবার জন্য দুবোন এসেছে। শার্লট বলল-ঘরের সঙ্গে বাথরুম রয়েছে।

চালর্স তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে শার্লটের দিকে তাকায়।

-ধন্যবাদ। কিন্তু ম্যাডাম আপনার নামটাই জানা হল না।

–শার্লট ডিনসমেড।

–এই অধমের নাম...

–শুনেছি।

–সুন্দরী মেয়ের সাথে কথা বলা থেকে ভগবান বঞ্চিত করে রেখেছে।

মেরী বলে–টেবিলে আপনার জন্য জল আছে। তবে টেবিলটা পরিষ্কার করতে পারিনি।

–যা করেছেন তাই যথেষ্ট। আপনার নামও অজানা।

–মেরী ডিনসমেড।

–দুঅক্ষরের ছোট্ট সুন্দর নাম। আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি।

দুই বোন বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে চলে গেল। ক্লান্ত চালর্স শুতে যাবার আগে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়ে চমকে গেল। এভাবে এটা কে লিখল? কার লেখা হতে পারে? এ ধরনের লেখার অর্থ বা উদ্দেশ্য কী হতে পারে? এর পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে?

চার্লস আবার লেখাটার দিকে তাকায়, টেবিলের ধুলোর উপর লেখা আছে–এস.এ.এস. অর্থাৎ সেভ আওয়ার সেলভস–এই লেখাটার কীই বা হেতু হতে পারে?

আর কিছুই ভাবতে পারে না চার্লস, ক্লান্ত হয়ে অবশ দেহে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তবে ভোরেই জানতে হবে কথাটা কে লিখেছে এবং কেন? নইলে সে এখান থেকে যেতে পারবে না।

পাখির ডাকে চার্লসের ঘুম ভাঙে, চোখ মেলে বাইরে তাকায়। চোখ জুড়িয়ে যায়। অদূরে পাহাড়, চারিদিকে ঘন জঙ্গলের জটলা, পরিষ্কার আকাশ, সূর্য ওঠার প্রতীক্ষা। সে এক অনিন্দ্য সুন্দর মুহূর্ত।

চার্লস এসে বাগানে গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে থাকে, ঠিক তখনই সে মেরীকে দেখে গাছের পরিচর্যা করেত।

–গুড মর্নিং, মিস মেরী।

–গুড মর্নিং, মিঃ চার্লস।

–আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।

–আমাকে? বলুন।

–গতরাতে আমার ঘরের টেবিলে কে এস.ও.এস. লিখেছে?

–আমি।

–কেন?

–তা জানি না।

–না জেনেই লিখেছেন? বিশ্বাস হয় না।

–আমি যাই বলে মেরী আর দাঁড়ায় না।

চার্লস আশ্চর্য হয়ে ভাবে মেরী ওভাবে চলে গেল কেন? এর পেছনে কী রহস্য থাকতে পারে? শার্লট বাগানের দিকে আসছিল কিন্তু চার্লসকে দেখেই চলে যেতে চায়। চার্লস বলে–মিস শার্লট, গুড মর্নিং।

-গুড মর্নিং, মিঃ চার্লস।

-প্লিজ, চলে যাবেন না। একটা কথা, আপনি কী কাল আমার ঘরের টেবিলে এস.ও.এস. লিখেছেন?

-না, আমি যাই।

দাঁড়ান আমার মনে হয় আপনি লিখেছেন।

–কিসে বুঝলেন? আর যদি লিখেও থাকি তাতে কী হয়েছে? শার্লট হাসে।

–না, কিছুই হয়নি। কথাটার মানে জানেন?

–না। চলুন ব্রেকফাস্ট তৈরি।

–হ্যাঁ, চলুন।

চার্লস ভাবে, এই এস.ও.এস.-এর মধ্যে কী রহস্যের সৃষ্টি হতে পারে?

.

০৯.

স্বনামধন্য গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো, বহু রহস্যের জাল ভেদ করে খুনীকে ধরেছে। যার প্রশংসায় সবাই ধন্য ধন্য করেছে।

— পোয়ারো বার কয়েক চেষ্টার পর চার্লসের লাইনটা পেয়ে যায়। চার্লস তার কলেজের বন্ধু। একে অপরকে মনের কথা ব্যক্ত না করে থাকতে পারে না। তবে পোয়ারোর লাইনের গোপনীয়তা যৌক্তিকতা চার্লস বোঝে। কারণ সে ভালো করে জানে সব লাইনের কিছু না কিছু গোপনীয়তা আছে। যা নিজের স্ত্রীর কাছেও বলা যায় না। অবশ্য পোয়ারো চার্লসের কাছে অনেক কথাই অকপটে বলে এবং বুদ্ধি পর্যন্ত নেয়।

-হ্যালো!

–হ্যালো, আমি পোয়ারো বলছি।

–বলুন স্যার।

–তোমার সাহেব ফিরেছে?

–না স্যার, সেই জন্য বড় চিন্তায় আছি।

–চিন্তার কিছু নেই। কোথায় গেছে জানো?

–না স্যার।

সঙ্গে আর কেউ গেছে?

–না, একাই গেছে।

–এলে আমায় ফোন করতে বলল।

–আচ্ছা স্যার। গুড নাইট।

.

-হ্যালো।

–চার্লস ফিরেছে? পোয়ারো জানতে চায়।

–না স্যার, রাত প্রায় এগারোটা বাজে।

–ঠিক আছে যত রাতেই ফিরুক আমায় ফোন করো।

নিশ্চয়ই স্যার।

.

পরদিন সকাল নটা নাগাদ চার্লস ফিরেছে। তবে নিজের গাড়িতে নয়, কিছুটা ট্রাকে এবং বাকিটা ট্যাক্সিতে। ডিনসমেডের জিম্মায় গাড়িটা রেখে এসেছে। উনি গ্যারেজ থেকে লোক আনিয়ে সারিয়ে চার্লসের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

চার্লস বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন চাকর বার্ট নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। সে বাড়ির চাকর হলেও তার অবিবাহিত জীবনে বিরাট ভূমিকা আছে।

চার্লস তাকে বুঝিয়ে বলার পর বার্ট বলে–স্যার এক্ষুনি একবার মিঃ পোয়ারোকে ফোন করুন।

-হা করছি। কয়েকবার ফোন করেছে তো?

–হ্যাঁ স্যার।

–এক কাপ কফি দাও তো।

–এক্ষুনি আনছি। কাল রাতে উনি দুবার ফোন করেছেন, সকালেও দুবার ফোন করেছেন।

–তাই নাকি? ভাবছিলাম একটু বিশ্রাম নেবো, এক্ষুনি একবার যাই। বলে উঠে দাঁড়াল।

–স্যার কফি খাবেন না?

–না থাক।

একটা ট্যাক্সি ধরে মিনিট দশেকের মধ্যে পোয়ারোর বাড়ি পৌঁছালো চার্লস। পোয়ারো একটু ধমকের সুরে বলল–এই যে ধাড়ি খোকা, তোমার খবর কী?

-খুবই গুরুতর।

–তা কাল প্রেজার ট্রিপ মারতে কোথায় গিয়েছিলে? গ্রীন উড ছাড়িয়ে? সঙ্গে কে ছিল?

–কেউ না। কফি আনতে বল।

তারপর কফি এলো। কফি খেতে খেতে চার্লস ডিসমেডের পরিবারের প্রশংসা করে তাদের আতিথ্যের বর্ণনা করল এবং বলল রাতে তাকে থাকতে না দিলে সে জীবন পেত না!

বন্ধু, ও অবস্থায় কেউ কাউকে ফেরাতে পারে না।

–এবার আর কোথাও তোমায় ছাড়া বেরোচ্ছি না। তার আগে তোমায় ডিনসমেডের দুই কন্যার বিবরণ দিই। বন্ধু, বয়সে বড়ই ছোটা।

–গল্পটার গোড়াতেই কেঁচিয়ে দিলে।

বুঝিয়ে বলবে তো কীসে?

–সাধে কী তোমায় লোকে অবিবাহিত বলে?

বন্ধু, তুমিও তো একই দোষে দোষী।

–তা বয়স কত? একেবারে মায়ের কোলে দুধ খাচ্ছে না তো?

–না তা নয় দুজনেই সতেরো আঠারো হবে।

–এইজন্যই বলি অবিবাহিত লোকগুলো যেমন অবিবেচক তেমনি আহাম্মক।

বন্ধু, উপরে থুতু ছেটালে তা নিজের গায়ে এসেই পড়ে।

-তা ঠিক। তবে তোমার মতো আহাম্মক নই। একটু উঁচু ধরনের। কেউ সাতেরো আঠেরো বয়সের মেয়েদের বলে বয়সে বড়ই ছোটো।

বন্ধু, তোমার বয়স কত?

–ওদের সঙ্গে কথা বললে আমাদের বয়সও তখন পঁচিশের নিচে গিয়ে দাঁড়াতো। নইলে সেদিন পার্টিতে মিস জার্ডিন আমার সান্নিধ্য না পেয়ে অভিমানে কত কী বলেছিলো।

–আর তুমি কথা দিয়েও পরের দিন জার্ডিনের বাড়ি যাওনি।

–আহাম্মক তো।

–স্বীকার করছ? চার্লস হো হো করে হাসে–আজ আর অফিস গেলাম না।

হা ডুব মারলে তো দেখতেই পাচ্ছি আর তার সঙ্গে আমারও ক্ষতি করালে।

বরং তোমায় একটা কেস দিতে এসেছি।

–এখন আর কোনো কেস না। দুটো কেস সমাধান করতে গিয়ে নাজেহাল, এখন শুধু বিশ্রাম।

–তাই বুঝি কাল আমার সাথে প্রেজার ট্রিপে গেলে না? বিশ্রাম তোমার ঠিকুজি কোষ্ঠিতে নেই। ভগবান তোমার পায়ে চাকা লাগিয়ে দিয়েছে বন বন করে ঘোরার জন্য। আর মন দিয়েছে চিন্তা ভাবনার জন্য। এই কাজ করার স্পৃহা তোমার মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে। আমার অফিস ডুব মারার প্রসঙ্গে তুমি বললে, এসে আমার কাজের ক্ষতি করেছ।

ব্র্যাভো বন্ধু।

–আধা গোয়েন্দা কী বলো? তবে তোমার ট্রেনিং-এ কিছুদিন থাকতে পারলে পুরো হয়ে যেতে পারি।

তুমি অন্তত হবে না। নইলে মিস হবসের মতো পাত্রীকে তুমি প্রত্যাখ্যান করো। সে বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী।

-করাটা বোধহয় উচিত হয়নি। আসলে সেদিন আধো অন্ধকার জায়গায় আমায় টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে গদগদ গলায় কী সব বলতে লাগলো, তাতেই আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে পালিয়েছি।

-তুমি একটা ইডিয়েট।

–বল, আমরা ইডিয়েট।

পোয়ারো হাসে–সত্যি বোধহয় তাই। তা কেসটা কী একটু শুনি।

দ্যাটস লাইক এ গুড বয়। এর মধ্যে একটা ঘন রহস্যের জাল আছে সেটা বার করতে। হবে।

–একটু খুলে বলো তো।

–তাহলে কেসটা টেকআপ করলে?

–আগে কেসটার মেরিট বুঝি।

–মেরিট আছে। আমার দুটো জিনিসের ওপর দারুণভাবে সন্দেহ আছে।

–সে দুটো জিনিস কী?

-প্রথমত আমি মিঃ ডিনসমেডের বাড়িতে ঢুকে তার ছেলে জর্জ ও স্ত্রী-এর সঙ্গে পরিচয় করার পর তার দুই মেয়েরা এলো।

–তাদের নাম।

–মেরী ও শার্লট।

এদের মধ্যে কে বড়ো?

–মেরী।

–বয়স কত?

–আঠারো হবে। শার্লটের বয়স সতেরো হবে। দুজনেই আমার কাছে এসে পড়বার পর মিসেস ডিনসমেড চাপা গলায় শার্লটকে হিসহিস করে উঠলো। কেন জানি না।

-তারপর কী হল?

–শার্লট চলে গিয়ে একটু পরে ফিরে এল।

–হঠাৎ চলে গেল কেন?

–তা ঠিক বুঝতে পারলাম না, তবে শার্লট যখন এল তখন ওর চুলের রং ধূসর দেখলাম। কিন্তু আমার মনে হয় ওর চুলের সে রং ছিল না।

–কী রং ছিল?

–সম্ভবত সোনালি। কিন্তু মিসেস ডিনসমেড ওভাবে শার্লট বলে ডাকল কেন? আর কেনই বা শার্লট চলে গিয়ে একটু পরে ফিরে এল?

-তুমি কী ওদের কিছু জিজ্ঞেস করেছ?

-না আসলে তখন সবে আশ্রয় পেয়েছি শেষে যদি ঘাড় ধরে বের করে দেয়, আর সব ব্যাপারে কৌতূহল ভালো না।

–আর দ্বিতীয় পয়েন্ট?

–আমায় শুতে দেওয়া হয়েছিল একধারে কোণের ঘরে। আমায় ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে দুই বোন লজ্জিতভাবে বলল টেবিলটা ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়নি।

–তুমি গলে গিয়ে তখন কী বললে?

–অবজেকশান। তবে সাময়িকভাবে গলে গিয়ে হেসে বললাম, যা করেছেন যথেষ্ট। এরপর বাথরুম থেকে ফিরে এসে টেবিলের উপর দেখলাম এস.ও.এস.লেখা।

এস. ও. এস.?

—হ্যাঁ।

–কাউকে লিখতে দেখেছ?

–না। হয়তো দুবোনের মধ্যে কেউ লিখেছে।

–তুমি বাথরুম থেকে এসে কাউকে দেখনি।

–না।

–তুমি কখন কোথায় জিজ্ঞাসা করেছ?

–সকালে বাগানে পায়চারী করার সময়।

ডিনসমেড দম্পতি জানে?

–না।

এই বলে চার্লস মেরী ও শার্লটকে যা যা বলেছে বা তারা যা যা বলেছে সবই জানায় পোয়ারোকে। তাকে চিন্তিত দেখায়। চার্লস জানায় পোয়ারোকে এই ঘটনার কারণ বের করতে হবে। পোয়ারোকে বেশ গম্ভীর দেখায়।

.

১০.

বেলা বারোটায় মাঝারি আকারের একটা ঘর নিয়ে ছোট্ট কোম্পানিডিনসমেড কনস্ট্রাকশনের সামনে দাঁড়ায় পোয়ারো। ভেতরে একটা অল্পবয়সী ছেলে কাজ করছে আর টেবিলের ওপর একটা বাড়ির প্ল্যান দেখছে ডিনসমেড।

কালো রং-এর ওপর নীল লাল স্ট্রাইপ করা স্যুট, পায়ে চকচকে স্যু, টাইয়ের রং নীল তার ওপর সাদা কাজ। ভেতরে ওয়েস্ট কোট তার ওপর দিয়ে সাদা জামা উঁকি মারছে।

সুপ্রভাত জানিয়ে ডিনসমেডের সঙ্গে আলাপ করেন পোয়ারো। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে মিথ্যে কথা বলে। বসবাস স্থান জানায় ওয়েস্ট রোড আর পেশা হিসাবে বলে কলেজের শিক্ষকতা। ডিনসমেড তার পোশাকে সম্মানিত বলে আখ্যা দিয়ে বলে

-একটু কফি আনাই?

–না, এক্ষুনি খেয়ে বেরিয়েছি। আর শুধু কফির ওপর দিয়ে চালালে হবে না। আপনার আতিথ্যের প্রত্যাশায় চার্লস পঞ্চমুখ। তাই একদিন সকালে ওর সঙ্গে আপনার বাড়ি যাবো আর ফিরবো সন্ধ্যা বেলায়।

ডিনসমেড রাজী হয়। গ্রামের দিকে বাড়ি হবার জন্য পোয়ারো শহরের সঙ্গে সে জায়গার তুলনা করে জানায় খুব ভালো জায়গায় বাড়ি। তারপর বাড়ির দাম শুনে অবাক হয়ে যায় পোয়ারো, মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা, এই চড়া দামের বাজারে। তারপর পোয়ারো জানতে পারে পনেরো বছর হল তারা ওখানে। প্রথমে তার স্ত্রীর আপত্তির কথাও পোয়ারোকে জানায়।

তারপর পোয়ারো বলে–যদি আমি আপনার বাড়ি যাই তবে আপনার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী বিব্রত বোধ করবে না তো?

-না না, আমার স্ত্রী ভীষণ মিশুকে। আর ছেলে-মেয়েরা কলেজে পড়ে, ওরা সঙ্গী চায়।

–গুড, ছেলে না মেয়েরা বড়ো?

–মেয়েরা।

–মেয়েরা কোথায় পড়ে আর ছেলে কোথায় পড়াশুনা করে?

–মেয়েরা কুরীতে আর ছেলে হোবার্ট ইনস্টিটিউটে পড়ে।

আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরোবার মুখে পোয়ারোর চোখে পড়ে একটা ছবি, এতে একজন মিঃ ডিনসমেড অপরজন কে?

অপরজন রবার্ট।

পোয়ারো রবার্টের সম্বন্ধে সবকিছুই জানতে পারে ডিনসমেডের কাছ থেকে। তারপর আবার একটা মিথ্যের জাল বোনে। বলে–আমার এক বন্ধু খুব ভালো ফুটবল খেলত। খেলতে খেলতে আঘাত পেয়ে তাতেই মারা যায়। সেই থেকে আমি আর খেলার মাঠে যাই না। কোথাও ফুটবল সম্বন্ধে আলোচনা হলেও আমি সেখান থেকে চলে যাই।

-এখনো তার কথা ভোলেননি, বোঝা যাচ্ছে।

–এরপর হয়তো ভুলে যাবো। আপনার তো আমার মতোই অবস্থা।

–হ্যাঁ, আসলে বড় বেশি রবার্টকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম।

কলেজের সামনে

১১.

পোয়ারো একটা কলেজের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘড়িতে তখন বেলা এগারোটা। পরিচয়পত্র দেখে দারোয়ান পোয়ারোকে সম্মানের সাথে ভেতরে যেতে বলে। সামনে একটা বিরাট লন। সেখানে মৌসুমি ফুলের জটলা। তারপরই একটা বাড়ি, সেটা কলেজ বিল্ডিং নয়, কিছু কেরানি ধরনের লোক সেখানে কাজ করছে। তাদেরই একজনকে পোয়ারো মেরী ডিনসমেডকে ডেকে দিতে বলে।

-কীসে পড়ে?

–তা ঠিক বলতে পারছি না।

–ঠিক আছে ঘড়ির নিচে বসে আছেন জ্যাকসন, আপনি ওর কাছে যান।

জ্যাকসনের সামনে গিয়ে পোয়ারো তাকে সুপ্রভাত জানায়। জ্যাকসন খুশী নয়। কারণ সামনের মাসে তাকে অডিটের মুখোমুখি হতে হবে। তবে পোয়ারোর সম্ভ্রান্ত পোশাক দেখে সে কথা না বলে পারে না। শুধু কথাই নয় তিনটে খাতা খুঁজে সে মেরী আর শার্লটের খোঁজ বার করে। মেরী বি.এ. সেকেন্ড ইয়ার, সেকশন-বি, রোল নং ৩১ আর শার্লট বি.এ. ফাস্ট ইয়ার, সেকশন-এ, রোল নং-২৫।

তাদের সঙ্গে দেখা করতে তিনটে বাজবে তাই একটা স্লিপে নাম লিখে পোয়ারো ভিজিটার্স রুমে বসে।

এখানেও মিথ্যে। স্লিপে লেখা চার্লসের বন্ধু এলবার্ট জোন্স। হলুদ বাড়ির একতলায় সে অপেক্ষা করছে।

পোয়ারো দুজনের নামে স্লিপ লিখে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেরী আসে, চার্লস না তার বন্ধু? তাই একটু অস্বস্তি হচ্ছে।

ভিজিটার্স রুমে ঢুকে মেরী দেখল বেশির ভাগ পুরুষ তাদের বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করতে এসে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। দূরে কোণায় একজন সম্ভ্রান্ত পোশাকের মানুষকে দেখে মেরী বোঝে সেই চার্লসের বন্ধু।

ওদিকে পোয়ারো বুঝতে পারে না, এটা মেরী না শার্লট। পরনে সবুজ মিনি স্কার্ট, গায়ে লাল সোয়েটার ফুলহাতা, স্লিম ফিগার, চোখ কটা, চুল ধূসর, পায়ে হাই হিলের জুতো। কালো স্ট্রাপ, হাঁটু পর্যন্ত মোজা পরেছে। পোয়ারো বলে–আমার নাম...

-শুনেছি।

–আপনি মিস ডিনসমেড তো?

–হ্যাঁ, মেরী ডিনসমেড।

–চার্লস তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

–কেন? মুখে হাসি।

–তার জবাব তো আপনি নিজেই।

–কী সে?

–আয়নায় তো রোজই নিজেকে দেখেন তাও বলতে হবে কেন। চার্লস আবার আপনাকে দেখার জন্য আগ্রহী।

-উনি এলে খুশী হতাম। আসতে বলবেন।

–আর ওর বন্ধু হয়ে আমি বুঝি বাদ?

–না না, তা কেন?

–মুখে বলছেন বটে তবে আমার কপালটা খারাপ। নইলে এই বয়সে ঘরণী জুটল না।

মেরী জানায় ঠিক বয়সে বিয়ে না করার জন্য দুই বন্ধুর চালচলন একেবারে এক।

আস্তে আস্তে চর্লস চিন্তিত বলে পোয়ারো জানতে চায় এস.ও.এস. লেখার অর্থ। মেরী ওটা লিখেছে বটে। কিন্তু সঠিক মানে সে জানে না। হঠাৎ লিখলই বা কেন তাও একটা রহস্যজনক।

জাহাজ বিপদে পড়লে...এই সঙ্কেত লেখা হয়। পোয়ারো আরো জানায়, চার্লস মেরীকে সাইক্রিয়াস্টিকে দেখাতে ইচ্ছুক। মেরী লাজুকভাবে দেখাতে রাজী হয় না। তারপর এস.ও.এস. লেখার কারণ মনে পড়লে জানাতে বলে বিদায় নেয় পোয়ারো। যাবার আগে বলে যায় এই কথা বাড়িতে গিয়ে যেন সে না জানায়।

যাবার আগে মেরী জানায় তার বোন শার্লট সেদিন যায়নি।

.

১২.

চার্লস অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিল। দিন তিনেক পর ফিরে পোয়ারোকে ফোন করে। এই ট্রিপে সে পেনিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সে চার্লসের ঠাকুরমা।

পোয়ারো মেরীর সাথে দেখা করার ঘটনা সব বলল। চার্লস প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না। পোয়ারো বলে সে একবার তাদের বাড়ি যাবে। আরো জানায় পোয়ারো, মেরীকে বলেছে চার্লস তার প্রেমে পড়েছে আর শার্লটের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন বলবে পোয়ারো নিজেই তার প্রেমে পড়েছে।

চার্লস বলে–দেখো কিছু অঘটন করো না।

-তোমার হিতোপদেশ মনে রাখব। তবে আজ সন্ধ্যার পর আসছ তো?

–ও নিশ্চয়ই, ছাড়ি।

–হু।

.

১৩.

পোয়ারো কলেজে গিয়ে সোজা জ্যাকসনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। জ্যাকসন আজ বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্য একটু তাড়ায় আছে। সে একটা কাগজে লিখে পাঠায় শার্লটের কাছে।

ভিজিটার্স রুমে ভিড় নেই। আজও পোয়ারো সুন্দর পোশাক পরে এসেছে।

শার্লট লাজুক হলেও তার মধ্যে জড়তা নেই। তবে প্রেমিক থাকে গ্রীন উডে আর কলেজে কোনোদিনই আসে না। তাই একটু অবাক হয়ে সে ভিজিটার্স রুমে ঢুকলো।

সতেরো বছর বয়স, পাতলা চেহারা, পান পাতার মতো মুখ, সত্যিই সে সুন্দরী। পোয়ারো চিনতে পারে শার্লটকে কিন্তু তার নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে হল মুশকিল। আগের দিনের নাম ভুলে গেছে সে। এক ফুটবল প্লেয়ারের নাম মনে পড়তে বলে ববি চালটন তার নাম।

পোয়ারো ডিনসমেড বাড়ির প্রশংসা করে কথা শুরু করল। শার্লটের হাসিমাখা মুখ দেখে পোয়ারো ভাবল কাজ হচ্ছে। এবার শার্লটের প্রশংসা মানে শার্লটের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করতে করতে আসল কথায় আসে। সেই এস.ও.এস.-এর কথায়।

শার্লট প্রথমে বলে সে লেখেনি, পরে বলে সেই লিখেছে।

শার্লটের এমন লেখার কারণ কী তার মনের দুঃখ, না, শার্লট জানায় বাবা-মার গম্ভীর মুখ দেখে তার মনে হয় বাড়িতে কোনো বিপদ হবে তাই এমনটা লিখেছে। পোয়ারো বলে–আপনাদের বিয়ের জন্য হয়তো চিন্তা করেন। আপনি তাই নিয়ে চিন্তা করবেন না। চার্লস তো খুব চিন্তা করছিল তাই আমায় জোর করে পাঠালো। নিজে অফিসের কাজে আটকে গেছে। যাক এবার উঠি।

কিন্তু চুল? যাবার সময় ইচ্ছা করে পড়ে গেল শার্লটের গায়ে এবং এতে তার চুলেও টান লাগল।

.

১৪.

চার্লস পোয়ারোকে ফোন করে। তখন পোয়ারো চার্লসকে তার বাড়ি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসতে বলে। কেসের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে চার্লস ধন্যবাদ জানায় পোয়ারোকে। কিন্তু আগেই সে ধন্যবাদ নিতে রাজী নয়, যদি কেস সমাধান না হয়? সেটা অসম্ভব জানায় চার্লস, আর অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

চার্লস পোয়ারোর বাড়ি আসে। কেস কতদূর এগোল তা পোয়ারো চার্লসকে জানায় না। চার্লস জিজ্ঞাসা করে না কারণ সে জানে তাকে পোয়ারো সময় হলেই জানাবে। পোয়ারো ডিনসমেডের বাড়ি যেতে চায় এমনই একদিন যেদিন সকলে বাড়ি থাকবে। তাই ফোন করতে বলল চার্লসকে, যুক্তি হল চার্লস ফোনে বলবে তার বন্ধু ওখানকার সুন্দর জায়গা আর বিশেষতঃ তাদের আতিথ্যের কথা শুনে ওখানে যেতে খুবই ইচ্ছুক, তাই ফোন করেছে।

পোয়ারো বলেসেদিন যার সঙ্গে কথা বলব তুমি তখন অন্যদের ব্যস্ত রাখবে।

সব কথা ঠিকঠাক। এতক্ষণে ডিনসমেড বাড়ি ফিরেছে তাই এইবার ফোন করা ঠিক ভেবে ফোন করল।

.

১৫.

ডিনসমেড পোয়ারো ও চার্লসকে আমন্ত্রণ জানায়।

ব্রেকফাস্টের পর মামুলি আলোচনা হয়, আর জর্জকে নিয়ে পোয়ারো যায় বাগানে। চার্লস ডিনসমেডের সঙ্গে কথা বলে।

বাগানের প্রশংসার পর পোয়ারো জানতে চায় জর্জের প্রিয় বিষয় সম্বন্ধে। জানে বিজ্ঞান আরো জানে বাড়িতে জর্জ একটা ল্যাবরেটরি খুলেছে আর বর্তমানে আর্সেনিক পাওয়ার

চেষ্টায় আছে, কলেজের বেয়ারা ম্যানেজ করে দেবে বলেছে। পোয়ারো জর্জকে বাড়িতে আর্সেনিক আনতে বারণ করে। জানায় বাড়িতে বিপদের সম্ভাবনা। টেস্টের অসুবিধা হলেও কিছুদিন ওই জিনিস বাড়িতে আনতে মানা করে পোয়ারো আর গোপন রাখতে বলে তাদের কথোপকথন।

বাগানে যখন পোয়ারো একা ঘুরছে সেখানে আসে মেরী। চার্লস চালাকি করে মেরীকে পাঠিয়েছে পোয়ারোর কাছে, বলেছে, পোয়ারো গাছ সম্বন্ধে কিছু জানে। অনেক কথার শেষে পোয়ারো আসে একই কথায় এস.ও.এস.।

মেরী জানালো এখনও তার মনে পড়েনি কেন সে ওরকম লিখেছিল তবে তার বছরখানেক ধরে এমনি মনে হচ্ছে কোনো বিপদ ঘটবে। কিন্তু সঠিক কারণ জানে না।

মেরী অবশেষে জানালো একটা অচেনা রাস্তার উপর তার বাবা তাকে একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ি নিয়ে যায়, মনে হয় সেই ভদ্রলোক উকিল। তবে তার বাবা তাকে একই রাস্তা অনেকবার ঘুরিয়ে ঐ বাড়িতে নিয়ে যায় বলে ব্যাপারটা তার কাছে আশ্চর্যজনক ঠেকে। যে লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল তার বয়স ষাট, মাথায় টাক, রোগা লম্বা।

পোয়ারো কথাটা গোপন রাখতে বলে এবং মেরী চলে যায়।

এরপর চার্লস শার্লটকে পাঠায় ধূমায়িত কফির ট্রে হাতে। বারবার কফি খাওয়ার জন্য মাফ চেয়ে নেয় পোয়ারো। তারপর শুরু হয় শার্লটের চুলের বর্ণনা। চুলে হাত দিতে চায়

পোয়ারো। আর টানও লাগে চুলে। ক্লিপ খুলে যায়। পোয়ারো এতক্ষণ শার্লটকে লম্বা চুল কাটতে বারণ করেছিল এবং বলে উঠল–এ কী মিস শার্লট আপনি ফলস হেয়ার পরেন?

শার্লট চমকে যায়-কই না তো।

.

শার্লট ভেতরে যেতে চাইলে পোয়ারো তাকে বাহুডোরে বন্দী করে জানায় সে শার্লটকে ভালোবাসে। তারপর জানতে চায় পরচুলা পরার কারণ।

শার্লট বলে তাদের বাড়ির সকলের ধূসর চুল তারই শুধু সোনালি চুল। তাই মার কথামতো এই চুল পরে। আরও জানায়, তার দুটো পরচুল পনেরো দিন অন্তর দোকানে পাঠায় ধোয়ার জন্য। আর ছোটোবেলার কথা জানতে চাইলে সে জানায় রজারের ভাড়া অ্যাপার্টমেন্টে ওরা থাকত। আবার এস.ও.এস.-এর কথা। এবং একই উত্তর এমনই। শার্লটের কাছ থেকে পোয়ারো জানতে পারে বাবা-মা এখনও তাকে দেখলে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। সাবধানে থাকতে বলে বাবা তাকে কোথাও নিয়ে গেলে জানাতে বলল শার্লটকে এবং বিদায় নেয়।

এরপর পোয়ারো আসে মিসেস ডিনসমেডের কাছে।

-আপনার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বেশ মিল। কেবল জর্জ বাদে।

–হ্যাঁ। ও বাবার মতো দেখতে হয়েছে।

–তবে মিস শার্লট আপনার চুল পেলেও রং পায়নি।

একথায় সুসান স্বাভাবিক দেখে পোয়ারো ভাবে ইঙ্গিতটা সরাসরি ধরতে পেরেছে। এতে শার্লটের ওপর নির্যাতন হবে না তো? সোনালি চুল তো অনেকের থাকে এতে লুকোবার কী আছে? পেছনে কোনো রহস্য আছে। তবে কী শার্লট ডিনসমেডের দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে?

হঠাৎ পোয়ারো বলে–শার্লটের বয়স কত?

–মেরী আঠারো আর শার্লট সতেরো।

–দেখলে শার্লটকে বড় মনে হয়।

–হ্যাঁ, অনেকেই বলে।

এরপর পোয়ারো যে কলেজের প্রফেসার বলে নিজেকে জাহির করেছে সেই কলেজের একটা ছেলের কথা জানালে তার বয়স ছিল কুড়ি। ছেলেটি টেম্পোরারি চাকরি করত কলেজে কিন্তু তার চাকরি চলে গেছে। চার্লস আর পোয়ারের বাড়িতে কাজের লোক আছে তাই মিসেস ডিনসমেডের বাড়িতে তাকে রাখতে বলে। সে রাজী হয়।

খাবার আগে মিঃ ডিনসমেডকে সপরিবারে পোয়ারোর বাড়িতে যেতে বলে। গত দুবছর ব্যাবসার চাপে সে বেরোতে পারেনি শুনেও পোয়ারো তাকে যেতে অনুরোধ করে। ওরা চলে যায়।

.

১৬.

সকাল সাড়ে দশটায় রজারের বৈঠকখানায় পোয়ারো আর রজার কথা বলছে, হঠাৎ রজার তার পরিচয় চাইলে পোয়ারো বলে তার নাম বিলি জোন্স আর সে আসছে ইনকাম ট্যাক্স থেকে।

পোয়ারো জানতে পারে বাড়িটা ষাট-সত্তর বছরের এবং ভাড়াটেতে ভর্তি। দোকান থেকে কম টাকা পেলেও অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেশ ভালোই টাকা পায়। রজার রিটার্ন সাবমিট করেনি জেনে পোয়ারো তাকে একটু ভয় দেখায়। রজার তাকে কিছু টাকা খরচ করে একটা উপায় বের করতে বলে। এই সুযোগ গ্রহণ করে পোয়ারো। সে টাকা চায় না, জানতে চায় মিঃ ডিনসমেডের কথা।

জানতে পারে আর্থিক অসঙ্গতির মধ্যেই তাদের জীবন কাটত। তাকে যখন এখান থেকে চলে যেতে বলা হয় তখন সে রজার-এর কথা শুনে চলে যায় বাড়ি কিনে। তবে গ্রীন উডের সেই বাড়িতে রজার যায়নি।

ডিনসমেডের পরিবার সম্পর্কে জানা যায় যখন সে এখানে থাকত তখন তার পরিবারে সদস্য বলতে ছিল তার স্ত্রী আর একটি ছেলে, বয়স দেড় বছর আর একটি মেয়ে, বয়স তিন বছর, এছাড়া আর কেউ ছিল না। ব্যাবসা আর বাড়ি এছাড়া লোকটা কিছুই জানত না। তবে একটি মাত্র বন্ধু ছিল রবার্ট। অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, তার বাড়ি যাতায়াত ছিল।

রজার রবার্টের সম্পর্কে কিছু জানত না। আর তার বাড়ি থাকাকালীন ডিনসমেড কোনো কন্যা সন্তানকে আশ্রিতা হিসাবে রাখেনি।

সমস্ত কিছু জানা শেষ হলে পোয়ারো রজারের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

.

১৭.

পোয়ারো হেনেসের অ্যাপার্টমেন্টের কলিং বেলটা পুস করে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। পোয়ারো আবার বেল বাজালে হেনেস এসে দরজা খুলে দেয়। হেনেসের বয়স পঁচাত্তর ছিয়াত্তর হবে, লম্বা শীর্ণ চেহারা, মোটা কাঁচের চশমা চোখে। মাথায় চুল নেই বললেই চলে।

–গুড মর্নিং, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

–আসুন, ভেতরে আসুন।

একটা জীর্ণ বৈঠকখানার ঘরে বসিয়ে,–আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে ভালো হত।

–আপনার উপরের অ্যাপার্টমেন্টে মিঃ রবার্ট থাকতেন, আমি তার বন্ধু।

–মিঃ রবার্ট তো আর বেঁচে নেই।

–হ্যাঁ, মাঝে দশ বছর ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই, এসে শুনলাম।

–বাইরে ছিলেন বুঝি?

–হ্যাঁ, আচ্ছা রবার্টের মৃত্যু কী করে হয়?

রেল অ্যাক্সিডেন্টে। স্টেশনের নামও বলল।

আরো আলোচনার পর পোয়ারো জানতে পারে রবার্টের বেঁচে থাকাকালীন ওর স্ত্রী মারা যান। আর এও জানতে পারে যে, ওদের একটা কন্যাসন্তান ছিল যার বয়স ছিল তিন বছরের কাছাকাছি।

–মেয়েটার নাম জানেন?

হেনেস চিন্তিতভাবে বলল–মনে করতে পারছি না।

–আচ্ছা, মেয়ের নাম কী শার্লট ছিল?

–শার্লট? হতেও পারে। বয়স হয়েছে স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে।

–মেরী হতে পারে কী? এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

–তাহলে তো ভেবেচিন্তে বলতে হবে। তবে মনেই পড়ছে না।

–আচ্ছা, মিসেস রবার্ট মারা যাবার পর মেয়েকে কে দেখাশোনা করত?

–মিঃ রবার্টের চাকর জোন্স আর একজন শিক্ষয়িত্রী মিস জুলিয়েট, ভারী মিষ্টি মেয়ে, আমায় অনেক কাজে সাহায্য করত। সে নিয়মিত পড়াতে আসত।

-আচ্ছা, তার সাথে কী মিঃ রবার্টের কোনো সম্পর্ক ছিল?

–অনেকে তো বলে তবে আমার মনে হয় সব বাজে কথা। আর সত্যি কথা বলতে রবার্ট তখন তাকে বিয়ে করলে আমি সবচেয়ে খুশী হতাম।

–জুলিয়েট কোথায় থাকে?

–শুনেছিলাম ধারে-কাছে। তবে এতদিন পর কী তার খবর পাবেন?

–ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, রবার্টের মৃত্যুর পর ওর মেয়ের কী হল?

-ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু মেয়েটাকে নেবার কথা বলেছিল। এতে জোন্স রাজী হয়েছিল আর তাকে আসতেও বলেছিল কিন্তু সে আসার পর দেখে জোন্স মেয়ে নিয়ে উধাও আর ফার্নিচার সহ অ্যাপার্টমেন্ট বেচে দিয়েছে।

-কোথায় গেছে জানেন?

–না, মিঃ ডিনসমেড বহু খোঁজ করেও ব্যর্থ হন।

–আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেড এখানে প্রায়ই আসতেন?

–হ্যাঁ, শুনেছি একই কলেজে পড়তেন। সেই সুবাদে

–রবার্টের মৃত্যুর কতদিন পর জোন্স উধাও হয়?

–তা দশ-পনেরো দিনের মধ্যে।

–সে পালাবার পর কী থানায় জানানো হয়েছিল?

–সেটা ঠিক মনে নেই।

–আচ্ছা, জোন্স যার কাছে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করেছে এখন গেলে তাকে পাওয়া যাবে?

–না, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে।

–ধন্যবাদ, উঠি।

.

১৮.

নির্দিষ্ট অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে পোয়ারো নক করতেই প্রায় পঞ্চাশ বছরের ভারী চেহারার, চোখে চশমা, মাথায় সাদচুলের রাশি, একজন মহিলা দরজা খুলল।

–আপনি মিসেস ম্যাকডোনাল্ড?

–হ্যাঁ।

–মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বাড়িতে আছেন?

–না।

–তাহলে একটু বিরক্ত করব।

–ভেতরে আসুন।

–আপনারা এই ফ্ল্যাটে তো রবার্টের চাকর জোন্স-এর কাছ থেকে কিনেছেন। লেখাপড়া কার সাথে হয়েছিল?

–জোন্সের সাথেই। তখন রবার্টের তো কেউ ছিল না।

–হ্যাঁ, তখন রবার্টের মেয়ে তো দুধের শিশু।

–হ্যাঁ, গুটিগুটি পায়ে হাঁটত। তবে তখনই সুন্দরী ছিল।

–জোন্স টাকা নিয়ে কী করল জানেন?

-না। তবে ও দেশে চলে যাবে বলেছিল। ওর বাড়ি বিক্রির জন্য খুব তাড়া ছিল। কেন জানি না।

–ওর সঙ্গে আপনাদের আর দেখা হয়েছে?

–না।

–আচ্ছা বাচ্চার নাম মনে আছে–শার্লট না মেরী?

–শার্লট না। ফুলের মতো বাচ্চা মেরী হতেও পারে।

–আচ্ছা, একটু মনে করে বলুন তো ওই বাচ্চার কোনো বিশেষ চিহ্ন...কাটা দাগ বা অন্য কিছু...

–অপরিচিত বলে দেখা দিয়ে ও পালাত, তাই খেয়াল পড়ছে না।

–আচ্ছা, এবার চলি।

–

-আপনাকে এক কাপ কফিও খাওয়াতে পারলাম না। আচ্ছা আপনি ওই মেয়ের সম্বন্ধে এতো খোঁজ নিচ্ছেন কেন?

আবার মিথ্যে–মানে..আমার ছেলে ঐ মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছে কিনা তাই একটু খোঁজ নিচ্ছিলাম।

-ও তাই বলুন।

–চলি।

.

পোয়ারো সেখান থেকে বেরিয়ে রবার্টের বাড়ির কাছে একটা স্কুলে গেল। এখানকার হেডমিস্ট্রেস মিসেস বার্জ তার বিশেষ পরিচিত।

পোয়ারোকে দেখামাত্র তিনি বেল বাজিয়ে কফি আনতে বলেন। হেসে–হঠাৎ আমার স্কুলে মতলব কী?

-এমনি, স্কুল দেখতে এসেছিলাম।

–সত্যি করে বলুন তো মতলবটা কী? আপনাকে দেখলে ভয় হয় কখন কোনটা নাড়া দিয়ে কী বার করে বসবেন তার ঠিক নেই।

–আপনার এক শিক্ষয়িত্রীর প্রেমে পড়েছি।

–প্রেম? তাও আবার আপনার ক্ষেত্রে? এই তো বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন। এবার দয়া করে আসল কথাটা বলুন তো।

–ব্যস্ত আছেন?

–তা ঠিক নয় আসলে আপনার কথাটা না শোনা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

–আপনার এখানে কত বছর হল?

–তা ধরুন কুড়ি বছর হবে।

–আপনার এখানে জুলিয়েট নামো কোনো মহিলা কী কাজ করতেন?

–আচ্ছা এটা কী অনেক বছর আগের কথা?

–হ্যাঁ।

–না, তবে ইদানিং ও-নামে পারমানেন্টলি কেউ নেই।

–টেম্পোরারি?

–তাহলে রেজিস্টারটা দেখতে হবে।

–তাই দেখুন, ঘটনাটা কিন্তু বছর পনেরোর কথা।

–ও গড। আপনার জন্য কুড়ি বছর ব্যাকেও যেতে রাজী।

–শুনে খুশী হলাম।

–তা আর এককাপ কফি চলবে?

–হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করতে হবে বুঝি?

মিসেস বার্জের নির্দেশে একজন ক্লার্ক তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পেল না। পোয়ারো অন্য এক স্কুলে গেল, সেখানে জুলিয়েট টেম্পোরারি কাজ করত। সেখান থেকে জুলিয়েটের ঠিকানা নিয়ে পোয়ারো চলে গেল।

.

১৯.

এবার আর জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা করা কষ্টের হবে না। হয়তো ছুটির দিনগুলোতে জুলিয়েট রবার্টকে কাছে পেত, মেয়ে তো তখন ছোট্ট। রবার্টের মৃত্যুতে জুলিয়েটের হাত নেই তো?–এই সব ভাবতে ভাবতে পোয়ারো সুইন স্ট্রিটে পৌঁছায়। পথের মাঝে গাড়ি থামিয়ে দুপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে এগোয়, খুঁজতে থাকে তেষট্টি নম্বর বাড়ি।

সহসা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তেষট্টি নম্বর বাড়ি। একতলা, সামনে ছোটো মাঠ, তাতে একপাশে দোলনা, স্লিপ, এককোণে ফুলের বাগান অনেকটা শিশু উদ্যানের মতো। বাড়ির রং হলদে।

বাড়ির সামনে গিয়ে বেল টিপতেই লম্বা গাউন পরা, তার উপর নীল হাইনেক সোয়েটার, বুকের বোম খোলা–বেরিয়ে দরজা খুলল জুলিয়েট।

–গুড মর্নিং।

–গুড মর্নিং, আমায় আসতে দেখে অবাক হয়েছেন।

–হ্যাঁ, তা একটু হয়েছি। জুলিয়েটের ঠোঁটে হাসি।

পোয়ারো খুবই চতুর, সেও হেসে–আপনার সঙ্গে দরকার ছিল।

দরকার! আসুন ভেতরে আসুন। জুলিয়েটের মনে সন্দেহ হয়।–বলুন কী করতে পারি?

তার অফিসঘরে অসংখ্য ফাইলপত্তর। আলমারি ভর্তি খাতা বই। পোয়ারো বসতে বসতে বলে–আমার মনে হচ্ছে আমি একটা স্কুলে বসে আছি।

-হ্যাঁ, এখনো ঠোঁটে হাসি। কিন্তু চাউনি তীক্ষ্ণ।

–এটা কিন্ডারগার্ডেন স্কুল বুঝি? চারিদিকে পোয়ারোর সতর্ক দৃষ্টি।

–হ্যাঁ, আপনার ধারণাই ঠিক। সে ভাবে সব কিছু জেনেই এসেছে।

–আপনিই চালান? আপনিই কী মালিক?

-হ্যাঁ, আমি একাই চালাচ্ছি, আর আমিই মালিক। জুলিয়েট অসহিষ্ণু। বয়স চল্লিশ, চুল বব করা, মাঝারি লম্বা চেহারা, চুলের রুপোলী রং তাকে আরও বৈশিষ্ট্যময়ী করে তুলেছে আর ভারিক্কি করে তুলেছে যা তাকে হেডমিস্ট্রেস হতে সাহায্য করে। চোখের চশমা তাকে ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছে।

–স্কুলটা কত বছর চালাচ্ছেন?

–তা প্রায় পনেরো বছর। তা আপনার আসার কারণটা যদি...

-ভুল হয়ে গেছে ওটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল। আপনার মিঃ রবার্টকে মনে আছে? আমি তারই বন্ধু। বিদেশ থেকে ফিরে ওর মৃত্যুর সংবাদ পাই। বছর পনেরো আগে আপনি তার শিশুকন্যাকে পড়াতেন।

রবার্ট শুনে চমকে ওঠে জুলিয়েট, পরে বলে–হ্যাঁ মনে পড়েছে। তার একটা সুন্দর মেয়ে ছিল তিন বছরের, আমার কাছে পড়ত। তারপর আর কোনো খবর জানি না।

-কেন?

–চাকর জোন্স ফার্নিচার সহ অ্যাপার্টমেন্ট বেচে মেয়ে নিয়ে কোথায় যেন পালিয়ে যায়। আমার এখনও বিশ্বাস হয় না।

–আমায় দয়া করে খুলে বলুন তো।

-ঐ মেয়েকে জোন্সের মিঃ ডিনসমেডের কাছে দেবার কথা ছিল কিন্তু সে তার কথা না রেখে সর্বস্ব বেচে পালিয়ে যায়। মিঃ ডিনসমেড বহু খোঁজ করেন জোন্সের দেশেও যান। কিন্তু কোনো লাভই হয় না। সেখানেও জোন্সকে পাওয়া যায় না।

–আচ্ছা, তারপর কী জোন্সের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?

–না।

–সেই মেয়েটার মুখ বা ওর চেহারার কোনো বৈশিষ্ট্য কিছু মনে পড়ে?

–তিন বছর বয়স ছিল যখন পড়তাম এখন সতেরো আঠারো হবে এর মধ্যে চেহারার কত পরিবর্তন হয়। তেমন কিছু মনে পড়ছে না। আচ্ছা আপনি ওর ব্যাপারে এত কথা জানতে চাইছেন কেন?

–মেয়েটাকে ফিরে পেতে চাই।

–ফিরে পেয়ে আপনার লাভ?

–লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন অবান্তর। অসহায় মেয়েটাকে আমার হেফাজতে রেখে মানুষ করতে চাই।

-ও।

-আচ্ছা আপনি রোজ সেখানে যেতেন?

–না, ছুটির দিনে যেতাম না।

–ঐ বাড়িতে তখন কার বেশি যাতায়াত ছিল?

মিঃ ডিনসমেডের। রবার্টের বন্ধু। আর কেউ বড় একটা আসত না। মিঃ রবার্ট মিশুকে ছিলেন না।

-আচ্ছা তার কোনো লইয়ার বন্ধু ছিল?

–না, আমি কোনোদিন দেখিনি, বাড়িতে দেখিনি।

–ওদের কথার সময় কী আপনি ওখানে থাকতেন? কী কথাবার্তা হত জানেন?

-মামুলি কথা। আবার অনেক সময় আমিই ওদের বিষয়বস্তু হতাম। মানে মিঃ ডিনসমেড চাইতেন আমার আর মিঃ রবার্টের...মানে আমাদের বিয়ে হয়।

লজ্জায় রাঙা হয় জুলিয়েটের মুখ।

–আচ্ছা আপনি কী রবার্টকে ভালোবাসতেন?

-সত্যিই আমি তাকে ভালোবাসতাম। প্রথমে তাকে এড়িয়ে চলতাম পরে ঐ অসহায় মানুষটার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি।

–মিঃ রবার্ট সে কথা জানতেন?

–আমি তাকে কোনোদিন বলিনি। তবে যেদিন মনে মনে স্থির করলাম তার পরেই তো শুনি ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

–কিন্তু আমি ভাবছি অ্যাক্সিডেন্ট হল কী করে?

–চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে।

–কী এমন তাড়া যে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেল।

–শুনেছিলাম ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর জেগেই স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে শুনে ধড়মড় করে নামতে গিয়ে নাকি দুর্ঘটনা ঘটল।

–আচ্ছা, পরের দিন কাগজে লেখা হয়েছিল?

–সামান্য,-চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে জনৈক ট্রেনযাত্রীর মৃত্যু।

–আপনি জানতেন রবার্ট সেদিন ট্রেনে করে কোথাও যাবে?

–হ্যাঁ, মিঃ রবার্ট আমায় বলেছিলেন। নইলে হয়তো জোন্স বলত। ও আমায় সব কথা বলত।

রবার্ট কীসে অফিসে যেত?

–গাড়ি করে।

–সেদিন রবার্ট অফিস যাবার পর আপনি কী করছিলেন?

–এই প্রশ্ন কেন? আপনি কী আমায় সন্দেহ করেন?

–না, তা নয়। আচ্ছা আপনি বিয়ে করেছেন?

–হ্যাঁ, তবে সে বিয়ে সুখের হয়নি ডিভোর্স হয়ে যায়।

–আচ্ছা বাচ্চাটার নামটা বলতে পারবেন?

-হ্যাঁ, রোজি, আমিই ঐ নামটা রেখেছিলাম। ওকে যে যা ইচ্ছে নামে ডাকত, বিশ্রী লাগত। আমি জোন্সকে বলেছিলাম সবাইকে বলে দিতে হবে যে, ওকে রোজি বলে ডাকতে। আর আমি কেন জানি না ওকে নিজের বাচ্চা বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম। সেই বাচ্চা কিনা...জুলিয়েটের চোখ দুটো চিকচিক করে উঠলো।

–আচ্ছা তার আগে বাচ্চাকে কী কী নামে ডাকা হতো মনে আছে।

–একশত নামে ডাকা হত এখন কী আর মনে থাকে?

–আচ্ছা ওর মেরী বলে কোনো নাম ছিল বা শার্লট?

–না, ওরকম নাম হলে আমিই নাকচ করে দিতাম।

–আচ্ছা, মিঃ রবার্ট তো ভালো ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। মেয়ের জন্য নিশ্চয়ই কিছু রেখে গেছেন?

–তা আমার জানা নেই।

–আচ্ছা, তার কোনো শত্রু।

–না, ওরকম মানুষের কিছুতেই শত্রু থাকতে পারে না, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি।

–সব কিছু কী আর নিয়ম মেনে চলে?

–হ্যাঁ, তা যে চলে না তার নিদর্শন মিঃ রবার্ট।

.

২০.

একজন গোয়েন্দার কাছে কেসের মেরিট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই পোয়ারো অন্য কেস বাদ দিয়ে এই কেসের কথাই ভাবছে।

কফি খেতে খেতে পোয়ারো অনেক কথাই ভাবছে। জোন্স কেন পালিয়ে গেল? এর পেছনে কী রহস্য? জোন্স বাচ্চাকে বাবা-মায়ের ভালোবাসা দিয়েছে। সে বাচ্চাকে খুবই

ভালোবাসত। এখানে থেকেও তো তা হত, তাহলে চোরের মতো গা ঢাকা দিল কেন? শুধু কী অ্যাপার্টমন্টে বিক্রির টাকার লোভে? তাও তো মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা। তা দিয়ে কীই বা হবে, তা কী সে জানত না? নাকি ভেবেছে ঐ টাকা দিয়ে জমিজমা কিনে চাষবাস করবে আর অন্যের বাড়িতে কাজ করবে, এইভাবে দুজনের পেট চলে যাবে। হয়তো ভেবেছে অন্যের কাছে থাকলে মেয়ের অবহেলা হবে আর এখানে থাকলে যদি মেয়েকে তার কাছে থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাই ভয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অন্যদিকে পোয়ারা নিশ্চিত ডিনসমেডের একটি মেয়ে হয় মেরী না হয় শার্লট। কিন্তু কে? মেরীর সাথে তাদের পরিবারের মিল নেই। তবে সে যে ঐ পরিবারের নয় এমন বলা যায় না। একই পরিবারে সকলের মিল থাকবেই এমন কথা নেই। শার্লটের সাথে মিল থাকলেও অমিলও আছে। তাই নিশ্চিত হবার জন্য পোয়ারো হেনেসের কাছে ওদের ছবি চেয়েছিল কিন্তু পায়নি।

-আচ্ছা জোন্সকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?

–তা হয়তো পারি কারণ পরিণত বয়সে মানুষ বড়ো একটা পালটায় না। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, স্বাস্থ্য ভালো, কথাবার্তায় মার্জিত ভাব, চুল ছোটো করে ছাঁটা।

–জাতে কী?

–মেক্সিকান। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।

পোয়ারো তারপর সেখান থেকে চলে এসেছিল।

কফির কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে এবার ভাবে–মিস জুলিয়েটের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি কেন? জুলিয়েট রবার্টকে ভালোবাসত। রবার্ট নির্বিকার ছিল। শেষে কী একরকম ক্ষিপ্ত হয়েই কী ট্রেন থেকে ধাক্কা মারে...। প্রেমের জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। জুলিয়েট ভেবেছে রবার্ট তার হবে না। তাই হয়তো ভীষণ পরিণতি।

পোয়ারো রবার্টের চলন্ত ট্রেন থেকে নামা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কারণ রবার্ট বড়ো তাই সে জানত আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়।

লোকাল ট্রেনে তিন মাইল অন্তর স্টেশন। পরের স্টেশনে নামতে পারত। অফিসের কাজে একটু দেরি হলে কী হত। সে একজন অফিসার, সামান্য বুদ্ধি কী ছিল না! ধোঁয়াটে লাগছে। পোয়ারোকে কুয়াশা ঘিরে ধরেছে।

জোন্স জানতো অ্যাপার্টমেন্টটা রবার্টের তাই কী সে এইভাবে রবার্টকে সরিয়ে সব নিজের করে নিয়েছিল....

মেরী না শার্লট ডিনসমেডের মেয়ে? তবে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বলেছে ওরা তাদের সন্তান এবং সন্তানরাও একই কথা বলছে। হয়তো ওরা তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছে তাই ওভাবে চলেছে। সেদিন ওরা এস. ও. এস. তাও মুখ খোলেনি। শুধু বলেছে একটা ভয়ের সংকেত পাচ্ছে।

বিপদ আসতে পারে। কিন্তু এখন কী ওদের ভুল ভেঙেছে? ওরা কী জানতে পেরেছে ওরা পরস্পরের বোন নয়।

আর শার্লটের পরচুলের ব্যাপার। কী কারণে সে পরচুল ব্যবহার করে? ওর সোনালি চুল গর্বের ব্যাপার। মেরী ও শার্লট–কে ডিনসমেডের মেয়ে? আর কেই বা রবার্টের মেয়ে হতে পারে?

হেনেস আর মিসেস ম্যাকডোনাল্ড দুইজনেই বলেছে শার্লট নয় মেরী হতে পারে।

জুলিয়েট বলেছে মেরী বা শার্লট না রোজি। রোজি থেকে মেরী হওয়া আশ্চর্যের নয়। কারণ রোজমেরী বলে কথা আছে। তাই এদিক ওদিক করে কার নাম রোজি হতে পারে?

পোয়ারো ভাবে মেরীর মধ্যে যে দুশ্চিন্তা তা শার্লটের মধ্যে কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

সব মিলিয়ে পোয়ারো পড়েছে একটা গোলকধাঁধার মধ্যে; কোনো কূলকিনারা নেই।

স্থানীয় থানার অফিসার

২১.

স্থানীয় থানার অফিসার মিঃ ওয়াকার পোয়ারোর বিশেষ পরিচিত। পোয়ারোকে দেখে তিনি বলেন–আরে মিঃ পোয়ারো বসুন? কেমন আছেন?

–ভাল। আপনি?

–চলে যাচ্ছে। তা ব্যাপার কী বলুন?

বছর পনেরো আগে এখানকার অফিসার আপনি ছিলেন? সেই সময়ে একটা কেসের ব্যাপারে এসেছি।

–হ্যাঁ, আবার গত দুবছর হল এসেছি। মনে হচ্ছে পুরোনো ঘটনা নিয়ে আপনার মনে কিছু আছে। তা ঘটনাটা কী?

–বছক পনেরো আগে এক ভদ্রলোক মিঃ রবার্ট ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান।

–কোথায় বলুন তো?

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। বাড়িতে একটা চাকর ছিল জোন্স। রবার্ট মারা যাবার পর সে রবার্টের শিশুকন্যাকে নিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে কোথায় চলে যায়। আমি তার খবর চাই।

–এতদিনের পুরোনো ব্যাপার...তা জোন্সের কোনো ছবি আছে?

–না।

–কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণা?

–ওর দেশের বাড়িতে।

–ওর দেশের বাড়ি কোথায়?

–সেটা জানার জন্যই তো এখানে এসেছি।

–অবশেষে বহু খুঁজে জোন্সের দেশের নাম আর ঠিকানা পাওয়া গেল। ছবিও পাওয়া গেল। রবার্ট সবকিছু জানিয়ে গিয়েছিল। পোয়ারো সব টুকে ওয়াকারকে অনুরোধ করে ছবি নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখে চার্লস।

চার্লস বলে–কোথায় থাক আজকাল?

–আগে একটু গলা ভিজিয়ে নিই। তুমিও পাবে।

ইতিমধ্যে পানীয় এসে যায়। পোয়ারো তাতে চুমুক দেয়।

–কাজে দারুণ ফেসে গেছি।

সেতো দেখছি। মেরী-শার্লট রহস্য কতদূর?

–একটু-আধটু ঘুরেছি তবে কেসে সেরকম মেরিট নেই, তাই এগোইনি।

চার্লস চুমুক দিয়ে তুমি তো এতো দায়িত্বহীন নও। যাক তোমার ব্যাপার। আমি উঠি।

–উঠবে? তাহলে আর আটকাবো না। পোয়ারো বুঝতে পারে চার্লস তার উত্তরে খুশী হয়নি। চার্লস যাবার পর পোয়ারো ফোনে জয়েন করে।

–হ্যালো! মিঃ এমিট কথা বলছেন?

-হ্যাঁ।

–আমি পোয়ারো।

–বলুন স্যার, অনেকদিন পরে আপনার ফোন পেলাম।

–এ কদিন তেমন কোনো কাজ ছিল না হঠাৎ একটা..যাক আপনি ফ্রি আছেন?

–আপনার জন্য সবসময় ফ্রি স্যার।

–তাহলে এখুনি আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসুন।

–এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার।

থ্যাঙ্ক ইউ।

দুইজনে মুখোমুখি বসে, হাতে পানীয়। এমিটের বয়স ষাটের কাছে। লম্বাটে ধরনের চেহারা এবং উপস্থিত বুদ্ধি আছে। সে পোয়ারো এবং অন্য গোয়েন্দাদের নানা তথ্য সংগ্রহ করে দেয়। এ ব্যাপারে তার সুনাম আছে। আগে পুলিশে কাজ করার জন্য একাজে তার অসুবিধা হয় না।

জোন্সের ব্যাপারে পোয়ারো এমিটকে সব বুঝিয়ে বলে–জোন্সের বয়স সাতান্ন হবে, তার সাথে একটা আঠারো বছরের মেয়ের থাকার কথা। সেই মেয়েটি কী করছে? আর জোন্সই বা কীভাবে জীবনযাপন করছে সবই আমার জানা দরকার।

-ঠিক আছে স্যার, তাহলে উঠি।

এমিট দিনতিনেক পরে ফিরে এসে জানায়–ওখানকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে ওটা জোন্সের দেশ তবে ওরা বলেছে জোন্স এখানে থাকে না। শহরে কাজ করে। সমস্ত গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি।

–তাহলে নিশ্চিন্ত যে জোন্স দেশে নেই।

–একেবারে ঠিক কথা স্যার।

–ঠিক আছে, আপনার বিলটা দিয়ে যাবেন।

–এরকম কাজ মাঝেমধ্যে পেলে খুশী হবো স্যার।

.

২২.

ডেইলি হারল্ড একটি নামকরা পত্রিকা। সারা পৃথিবীতে এদের প্রতিনিধি রয়েছে। এই অফিসে মিস লরেন্স কাজ করে। বয়স পঁচিশের নিচে হলেও কাজে দক্ষ। কাজে গাফিলতি নেই, যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে মিষ্টি হাসি দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ায়।

পোয়ারো এই লরেন্সের কাছে গেল। এর কাছ থেকে পোয়ারো যে কত সাহায্য পেয়েছে তা বলার নয়। পোয়ারো তিনতলার ঘরের সামনে গিয়ে দেখে লরেন্স একটা ফাইলে ডুবে আছে।

লরেন্স পোয়ারোর উপস্থিতি টের পেয়ে ফাইলের থেকে দৃষ্টি পোয়ারোর দিকে করে। লরেন্সের পরনে মিনি স্কার্ট উপরে হাইনেকের সাদা সোয়েটার। মাথায় একরাশ ধূসর বব চুল।

লরেন্স হাসে–কী খবর।

-তুমি অমন করে হাসবে না তো, যাদু আছে।

–যাদু? তাও তো ম্যানেজ করতে পারলাম না।

–একথা মনে থাকবে।

–থাকবে না। আসল কথাটা বলুন। আপনি তো আমার সঙ্গে গল্প করতে আসেননি।

অমন বলল না ব্যথা লাগে।

–কোথায়?

–বুকে। আজ ডিনারে কোথায় যাবে?

-নাইট ডিউটি ছেড়ে আমি যে আপনার সঙ্গে যাবো না তা জানেন বলেই এই অফারটা দিলেন।

–তাহলে একদিন লাঞ্চের অফার রইল।

–তাও নির্দিষ্ট করে বলতে পারলেন না।

–আই অ্যাম সো সরি।

–এবার আপনার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলে ভালো হত।

-ধন্যবাদ, শোনো, বছর পনেরো আগে মিঃ রবার্ট নামে এক ভদ্রলোক ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। আমি জানতে চাই তোমাদের কাগজে সেই সম্বন্ধে কী বেরিয়েছে।

–এক মিনিট। ইনডেক্স কার্ড থেকে নির্দিষ্ট কার্ডটা বার করে পোয়ারোকে দেয়।

তাতে লেখা রয়েছে–কর্মরত অবস্থায় সিটি ব্যাঙ্কের অফিসার মিঃ রবার্ট চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তবে এটা আত্মহত্যা কিনা তা নিয়ে পুলিশ সন্দেহ প্রকাশ করেছে আর তা নিয়ে খোঁজও চলছে।

–এরপর কোনো রিপোর্ট বেরিয়েছে?

লরেন্স রেফারেন্স কার্ডটা দেখে এসে জানায়, না। পুলিশ নিশ্চয় সন্দেহ করেনি। করলে...

-আমারও তাই মনে হয়। তাহলে উঠি।

–লাঞ্চটা? লরেন্স মিটি মিটি হাসে।

–পরের বারের জন্য তোলা রইল।

.

২৩.

সিটি ব্যাঙ্কের অফিসার ছিল রবার্ট। এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে পোয়ারার আলাপ নেই। তবে একজন এজেন্ট নাম ওয়েড বয়স পঁয়তাল্লিশ, বেশ ভারিকি ধরনের চেহারা তার সাথে পোয়ারোর আলাপ আছে। তারা একই স্কুলে পড়ত। ওয়েড তার ঘরে কাজে ব্যস্ত। মৃদু করাঘাতে পোয়ারো তার ঘরে প্রবেশ করে।

-আরে পোয়ারো যে; কী ব্যাপার?

–তোমাদের চাকরিটাই বেশ, তার সংসার ধর্ম করাই দেখছি ভালো।

–সংসার করবে নাকি?

–তেমন পাত্রী তোমার হাতে আছে নাকি?

–আছে। সদ্য বিধবা প্রচুর সম্পত্তির মালিক।

–তা তুমি একবার লড়ে যাবে নাকি?

ইচ্ছা তো ছিল। বুড়িবউ আর ছেলে-মেয়েরা গলার কাছে অক্টোপাসের মতো আটকে আছে।

–তা বুড়ি হল কীসে?

–দশ বছরের পুরোনো বউ বুড়ি নয়?

–ও, আচ্ছা ওয়েড, এখানে তোমার কত বছর চাকরি?

–তা পনেরো-কুড়ি বছর হবে।

–তুমি রবার্ট বলে কাউকে চেনো?

–রবার্ট...হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

-হ্যাঁ, আমি তখন প্রথম জয়েন করেছি। শুনলাম আগের অফিসার, কাজে যাচ্ছিল সেই সময় চলন্ত ট্রেনের থেকে পড়ে মারা যায়। তা বন্ধু তোমার এ কৌতূহল কেন? নিশ্চয়ই এমনই এত বছরের পুরোনো ঘটনা তুমি জানতে চাইছ না?

–একটু দরকার ছিল। আচ্ছা ওর সঙ্গে যারা কাজ করত তাদের নাম বলতে পারবে?

দাঁড়াও ভাবতে হবে। আগে একটু কফি খাও দেখি। তারপর বলে-ম্যানেজার মিঃ উইলসন, মিঃ রবার্টের সহকর্মী।

-তাহলে উঠি।

–বাঃ। কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী?

-বাঃ, সেই বিধবা পাত্রীটার সঙ্গে দেখা করতে হবে না? যাই মিঃ উইলসনের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। তার কাছে আমার আসল পরিচয়টা গোপন রাখাই ভালো।

-তথাস্তু। কিন্তু বন্ধু কোনো কারণে আবার ফেঁসে যাবে না তো? তোমার ব্যাপারে আমার বড্ড ভয় হয়।

-তুমি যে মহা ভীতু, চলি এবারে।

একজন বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে পোয়ারো মিঃ উইলসনের কামরায় টোকা মেরে দরজা ফাঁক করে বলল–ভেতরে আসতে পারি।

উইলসন ইন্টারকমে কার সঙ্গে কথা বলছিল। তাই ইশারায় পোয়ারোকে বসতে বলে। তার বয়স পঞ্চাশের কাছে, ঝকঝকে চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, মাঝারি গড়ন, পরনে নিখুঁত স্যুট।

উইলসন ফোনটা নামিয়ে রাখতেই পোয়ারো বলল-আপনাকে একটু বিরক্ত করব। কথাটা কিন্তু ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নয়।

-তাতে কী আছে? কারো ব্যক্তিগত প্রয়োজনও থাকতে পারে।

-ধন্যবাদ, আচ্ছা মিঃ রবার্টের কথা মনে আছে? তারপর ম্যানেজার জানায় রবার্টকে কখনও ভোলা যায় না, সে তার অনেক উপকার করেছে আর দুজনে একই সঙ্গে অফিসার হয়েছে। তার কাছ থেকে রবার্টের বাড়ি কেনার শখের কথা জানা যায়। তার স্ত্রী বেঁচে থাকাকালীন কিছু টাকা তার কাছে ছিল বাকি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তোলে বাড়ি কেনার জন্য। কিন্তু সেই টাকা কিছুদিন পর আবার ব্যাঙ্কে ফেলে দেয়। কয়েকদিন পর আবার সেই টাকা তোলে কিন্তু আর ব্যাঙ্কে রাখেনি। কার কাছে রেখেছে তা ম্যানেজার বলতে পারল না।

–আচ্ছা, রবার্টের ব্যাপারে পুলিশি তদন্ত হয়?

–হ্যাঁ।

–আচ্ছা, সেদিন কী মিঃ রবার্টের কাছে টাকাকড়ি ছিল?

–না।

-আচ্ছা, এটা কী আত্মহত্যা হতে পারে।

–তা হয়তো না, তবে স্ত্রী মারা যেতে ও ভীষণ আপসেট হয়ে পড়ে।

–ও কী অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসত?

–ও ওর স্ত্রীকেই ভীষণ ভালোবাসত।

–মিস জুলিয়েটের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেমন ছিল?

–ভালোই। ওকে আমি রবার্টের মেয়েকে পড়ানোর জন্য দিই।

–তবু একটু খুলে বলুন।

–একজন ভদ্রমহিলার প্রতি যতটা সম্মান দেখানোর সে দেখাতে। স্ত্রী মারা যাবার পর তাকে এড়িয়ে চলত।

–আচ্ছা, রবার্টের কোনো লইয়ার বন্ধু ছিল?

–যতদূর জানি, না, এখানে অন্তত আসেনি। ওর একটাই কাছের বন্ধু ডিনসমেড এখানে এসেছে বহুবার।

–টাকাটা কী অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে রেখেছে?

–না, রাখলে আমার পরামর্শ চাইত। আমি তাহলে না বলতাম। কার মনে কী আছে আগে থেকে বোঝা যায় না। আর টাকা? বউ মরে যাবার পর ও ভাবত যে ও কোনোদিন মরে যাবে।

-ওর মেয়ের খবর কিছু জানেন?

–শুনেছি জোন্স আর জুলিয়েটের কাছে মানুষ হচ্ছিল।

–জোন্স মিঃ রবার্টের অ্যাপার্টমেন্ট বেচে মেয়ে নিয়ে উধাও হয়।

–হ্যাঁ, খবরটা শুনে গিয়ে দেখি সত্যি।

–আচ্ছা এমনও তো হতে পারে টাকাটা জোন্সের কাছে ছিল?

হতেও পারে কারণ রবার্ট শেষের দিকে কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল।

–আচ্ছা, ওর মেয়ের নামটা মনে আছে?

–না, আসলে যে যার প্রিয় নামে ওকে ডাকত।

–আচ্ছা, সেই মেয়েকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন?

–একবার না, বহুবার। স্ত্রী, মেয়ে নিয়ে ও বহুবার আমার বাড়ি গেছে।

–মেয়েটির গায়ে কোনো চিহ্ন ছিল?

–না।

–আচ্ছা মিঃ রবার্ট মিস জুলিয়েটের কাছেও তো টাকা রাখতে পারে?

জানি না, কিন্তু কার উপর ভিত্তি করে একথা বলছেন?

–কারণ মিস জুলিয়েট যে একটা স্কুলে টেম্পোরারি কাজ করত আজ সে একটা কিণ্ডার গার্ডেনের মালিক।

–হয়তো নিজের টাকা আবার লোনও তুলতে পারে।

–ভাবছি মিস জুলিয়েটের প্রতি রবার্টের দুর্বলতা ছিল। কারণ ওর বয়সও তখন তরুণ। তাই...। ঠিক আছে মিঃ উইলসন, পরে দেখা হবে। বিরক্ত করার জন্য মাফ চাইছি।

-আরে না না।

.

২৪.

বাড়িতে গিয়ে পোয়ারো এমিটকে ফোন করে। সে ফ্রি জেনে তাকে পোয়ারো তার ফ্ল্যাটে আসতে বলে। এমিট জানায় পনেরো মিনিটের মধ্যে সে পৌঁছোবে।

বেলা সাড়ে এগারোটায় পোয়ারোর বৈঠকখানায় পোয়ারো আর এমিট পানীয় হাতে কথা বলছে।

–মিঃ এমিট এখন আপনার একমাত্র কাজ জুলিয়েটকে ফলো করা।

–ঠিক আছে।

–তাকে অন্তত দিন তিনেক ওয়াচ করবেন। আর দেখবেন সে যেন আপনাকে সন্দেহ না করে। সে কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে কথা বলছে, স্কুলে থাকাকালীন কী করছে? কে দেখা করতে আসছে সমস্ত।

–হুঁ। এমিট পানীয়ে চুমুক দেয়।

-আর একটা কথা। পরবর্তী কাজের কথা জানিয়ে বলে–এসব কাজে গোপনীয়তা রেখে চলবেন। তাহলে ঐ কথাই রইল।

–ঠিক আছে, এমিট বিদায় নেয়।

বেলা একটায় এমিট সানরাইজ স্কুলে ঢোকে। এক মিসেস-এর সঙ্গে দেখা হলে তার কাছ থেকে জেনে নেয় জুলিয়েটের ঘর এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জুলিয়েটের ঘরে যায়। সেখানে জুলিয়েট এক ছাত্রীর মার সাথে কথা বলছিল। এমিট ভিতরে ঢুকলে, জুলিয়েট ছাত্রীর মার সঙ্গে কথা শেষ করে তাকে বিদায় দেয়।

-বলুন।

–আমি হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

–আমিই।

–নমস্কার।

–নমস্কার।

–আমি ইনকাম ট্যাক্স থেকে আসছি।

–ও! জুলিয়েট একটু ভয় পেয়ে যায়।

–আপনার স্কুল কতদিনের? এমিট যেন ভারিকি চালে বলে।

–এই দশ পনেরো বছরের।

–সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। তা কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয়?

–কিন্ডার গার্ডেন থেকে স্ট্যান্ডর্ড-টু পর্যন্ত আছে।

–তাহলে তো মোটামুটি বড়োই স্কুল।

–আরো কয়েকটা ঘর হলে ভালো হত।

–হ্যাঁ ঢোকার মুখে একই ঘরে অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেখলাম। তা আপনি কী এখানেই থাকেন?

–হ্যাঁ। এরই সংলগ্ন বাড়িতে।

অন্য মিস্ট্রেসরা।

–অন্যত্র থাকে।

–বাড়িটা তৈরি করা না কিনেছেন?

–কিনেছি।

–কত টাকা? তা কাগজপত্র আছে তো?

–হ্যাঁ, লাখ টাকা দিয়ে।

–টাকা কোথায় পেলেন?

–আমার ছিল। একটু কফি আনতে বলি?

–মাফ করবেন আমি ডিউটিতে এসে কিছু খাই না। আপনার কাছে টাকাটা কী করে ছিল?

–আমি প্রথম জীবনে কয়েক বছর কাজ করেছি।

–কোথায় কাজ করতেন?

বেশ কয়েক বছর গভর্নের্স ছিলাম, তারপর স্কুলে কাজ করেছি আর আমার স্বামীও কিছু দিয়েছে।

–আমরা খবর পেয়েছি আপনি মাস দুয়েক মিঃ রবার্টের বাড়িতে গভর্নেস ছিলেন, তারপর কয়েকটা স্কুলে টেম্পোরারি চাকরি করতে করতে মিঃ স্মিথকে বিয়ে করেন, তাই না?

-হ্যাঁ, জড়তার সঙ্গে বলে।

-মিঃ স্মিথ একটা সামান্য কারখানায় কাজ করতেন, তিনি দেখতে সুপুরুষ বলে আপনি তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু সে বিয়ে সুখের হয়নি, শেষে বিচ্ছেদ হয়। পোয়ারোর শেখানো কথা এমিট গড়গড় করে বলতে থাকে।

–হ্যাঁ বাকি টাকা ধার করেছি।

–কোথা থেকে? ব্যাঙ্ক?

–না, মানে...জুলিয়েট ইতস্তত করতে থাকে।

–বলুন, চুপ করলেন কেন?

–আমার এক বন্ধু দিয়েছে।

বন্ধু? তার নাম ঠিকানা জানাবেন?

–জানাতে অসুবিধা নেই, তবে সে আর বেঁচে নেই।

–কত বছর আগে মারা গেছেন?

-বেশ কয়েকবছর আগে। দয়া করে আমায় তার নাম জিজ্ঞাসা করবেন না। জুলিয়েটের গলা ভারী হয়।

–আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু, কর্তব্যের খাতিরে নামটা আমায় জানতেই হবে।

–মিঃ রবার্ট।

–মিঃ রবার্ট। তা উনি কত টাকা দেন?

–প্রায় হাজার ত্রিশ।

–তার রিসিট নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?

হ্যাঁ, তবে লকারে আছে। জুলিয়েট নিরুপায় হয়ে মিথ্যে বলে।

–ও! আর বাকি টাকাটা?

–বললাম যে..

.–আপনার রিটার্ন সাবমিট করেন?

–না, লসে রান করছি। কী আর করবো?

–লস? তা স্কুলের অবস্থা দেখে তো মনে হয় না।

–উপর উপর ভালো। ভেতরটা ফাঁপা।

–তবু আপনার কথাটা মানতে পারছি না। এতদিন রিটার্ন সাবমিট না করে অন্যায় করেছেন। এবার থেকে করবেন।

-তার জন্য আমি লজ্জিত।

–ও কথা বললে হবে না। তার জন্য আপনাকে কিছু পেনাল্টি দিতে হবে। খুব সহজে ছাড়া পাবেন না।

-স্কুল লসে রান করছে, তা সত্ত্বেও?

-সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। যখন ইনকাম ট্যাক্স কল করবে তখন সব কাগজপত্র নিয়ে অ্যাপিয়ার হবেন।

-ঠিক আছে।

উঠি।

জুলিয়েট এমিটকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় তারপর দারুণ অস্বস্তি বোধ করে।

এমিট বাড়ি গিয়ে দ্রুত পোশাক পাল্টে নেয়। এখন তার পরনে ময়লা জামাকাপড়, গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি, জুতোর ওপর একপ্রস্থ ধুলো মানে খুব পরিচিত মানুষও হট করে তাকে চিনতে পারবে না। এমিট আবার জুলিয়েটের স্কুলে অদূরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতে থাকে।

.

২৫.

-হ্যালো।

–হ্যালো। আমি পোয়ারো বলছি।

–স্যার, আমি উড বলছি।

–তুমি কোথা থেকে আমায় ফোন করছ?

স্থানীয় একটা টেলিফোন বুথ থেকে।

–ঠিক আছে ওদের ফোন কখনও ব্যবহার করবে না। তা তোমায় কেউ সন্দেহ করছে না তো?

–আদৌ নয় স্যার।

–বল কী খবর?

–স্যার, মিঃ ডিনসমেডকে কদিন বেশ গম্ভীর দেখছি।

–কারণ কি? তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে?

–মন্দ নয়। তবে মাঝেমধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন।

–ক্ষিপ্ত? কেন?

ব্যাবসা নাকি আরো খারাপের দিকে চলছে। ও আর ওর স্ত্রী সংসার সামলাতে নাজেহাল। আর একটা কথা লক্ষ্যণীয়–স্বামী-স্ত্রী যখন কথা বলে তখন সেখানে কেউ থাকে না। ছেলে-মেয়েও না।

–আর ওদের কথার মধ্যে কেউ হাজির হলে?

সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে যায় আর প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে অন্য কথা বলে।

—তারা কী ধরনের আলোচনা করে শুনতে পেয়েছ?

-না, আসলে ওরা তখন খুব চাপা স্বরে কথা বলে। নানাভাবে চেষ্টা করেছি আবার বেশি সাহসেও কুলোয় না, পাছে ধরা পড়ে যাই।

–ঠিক বলেছ। খুব সাবধানে কাজ করতে হবে।

–ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অত্যন্ত মামুলি কথা বলে, যেন কথাগুলি আগে থেকেই স্থির করা।

–জর্জের খরব কী?

–জর্জ তো এখন আমার খেলার সাথী।

–এখনও কী ল্যাববারেটরি নিয়ে মেতে থাকে?

–না, আগের মতো না। এখন পড়ার পর বেশিরভাগ সময় আমার সাথেই কাটায়।

–মেরী নিয়মিত কলেজ যাচ্ছে?

–হ্যাঁ স্যার।

–ওকে নিয়ে মিঃ ডিনসমেড কোথাও বেরিয়েছিলেন?

-হ্যাঁ, একা ওকে নিয়েই গিয়েছিল। কথাচ্ছলে আমি মিস মেরীকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারি ও বাবার সঙ্গে বাবার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল।

–আর মিস শার্লট কী এখনও পরচুলা পরেন?

–প্রথম দেখেছি তবে এখন আর পরেন না।

–কেন?

–হয়তো প্রথমে ভেবেছে আমি কে দেখা দরকার তারপর নিশ্চিত হয়েই...

–আচ্ছা সে নিয়মিত কলেজ যাচ্ছে?

–হ্যাঁ, দুবোন একই সাথে যায়।

–আর কোনো খবর আছে?

–না স্যার, তবে মিস শার্লটকে কেমন নির্জীব দেখাচ্ছে।

নির্জীব? কেন বলো তো?

–ঠিক বুঝতে পারছি না।

-ঠিক আছে তুমি ভালো করে ওয়াচ করে যাও। আর প্রয়োজন হলেই টেলিফোন করবে। আর ঝট করে বুথ থেকে বেরিয়ে দেখো তো কেউ তোমায় ফলো করছে কি না।

–দেখছি স্যার।

এমিট রিসিভার নামিয়ে হট করে বাইরে বেরিয়ে দেখে কেউ নেই। রিসিভার তুলে জানায়–না স্যার, কেউ নেই। সব ঠিক আছে।

-তাহলে ঐ কথাই রইল।

–আচ্ছা স্যার।

আধময়লা জামাকাপড়

২৬.

পোয়ারোর পরনে আধময়লা জামাকাপড়। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, মুখে আট-দশ দিনের দাড়ি তাও কাঁচা-পাকা। পায়ে একটা তাপ্পি দেওয়া জুতো। পোয়ারো সন্ধেবেলা ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছে যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে।

চাদরটা ভালোভাবে মুড়ি দিয়ে পোয়ারো রেল স্টেশনে প্রবেশ করে। বেন্ট উডের একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্দিষ্ট ট্রেনের দিকে যেতে যেতে ভালোভাবে চারিধারে দেখে নেয় কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না।

তারপর ভিড়ের মাঝে একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে। বসার ভঙ্গীটা দেখার মতো। অন্য আর পাঁচজনের মতো সে পা তুলে গুটি মেরে বসেছে। তারপর আর সকলের মতো নিতান্ত সস্তা একটা বিড়ি ধরাল। বিড়ির উগ্র গন্ধে পোয়ারো কয়েকবার খকখক করে কাশল।

বেন্ট উড চলেছে পোয়ারো। থানায় লেখা আছে ওখানে নাকি জোন্স আছে। তবে তার সন্দেহ আছে জোন্সের দেখা পাবে কি না, কারণ এমিট বলেছে জোন্স নামে ঐ গ্রামে কেউ নেই।

তবু পোয়ারো নিজে গিয়ে তদন্ত করতে চায় আর জোন্সকে পেলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই তাকে প্রয়োজন। এবারে পোয়ারো বিড়িতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে। পাশের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে–বেন্ট উড়ে যাবার গাড়ি কটায়?

নটা চল্লিশে।

–তা বেন্ট উডে পৌঁছাবে কখন?

সাড়ে পাঁচটার আগে তো নয়ই। তুমি বুঝি প্রথম ওখানে যাচ্ছ?

–হ্যাঁ, বোকার মতো হাসে পোয়ারো।

–ওখানে তোমার কে আছে?

–এক খুড়তুতো ভাই।

তারপর ট্রেন আসতে পোয়ারো ভিড়ের মধ্যে গিয়ে বসল আর দেখে নিল কোনো চেনামুখ আছে কি না। না নেই। ইতিমধ্যে গাড়ি গতি নিয়েছে। এইভাবে ছটা নাগাদ গাড়ি বেন্ট উডে পৌঁছালো।

ছোট্ট স্টেশন, গাড়ি বেশিক্ষণ থামে না। পোয়ারোর মতো দু-একজন নামল, আরও কয়েকজন উঠল।

যে দুজন যাত্রী নেমেছে তারা স্টেশনে টিকিট জমা দিয়ে গেট দিয়ে হনহ করে বেরিয়ে চলে গেল। পোয়ারো স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে চা আর জলখাবার খেয়ে নেয়।

ঝকঝকে রোদ উঠেছে। জলখাবার খেয়ে পোয়ারো গ্রামের রাস্তা ধরে। সারি সারি মাটির বাড়ি। কোথাও বা একতলা পাকা বাড়ি। দূরে চাষের জমিতে কৃষকেরা চাষ করছে। একটা বাড়ির সামনে কয়েকজন লোক গোল হয়ে কাজের কথা বলছে। তাদের কাছে গিয়ে পোয়ারো বলল, ভাই-জোন্স কোথায় থাকে জানো? এই তার ছবি।

-না ভাই, এ ছবি চিনতে পারছি না। তাই গ্রামের নাম কী বলেছে?

–বেন্ট উড।

–তুমি এই গ্রামে প্রথম এলে?

–হ্যাঁ, আসলে বাইরে চাকরি করি তো।

–ও! আর একটু এগিয়ে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করো।

–আচ্ছা বলে, পোয়ারা চলে গেল। অনেকের কাছে জানতে চাইল কেউ বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত থানায় গিয়েও লাভ হল না।

পাশের গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। হঠাৎ পোয়ায়োর মাথায় এল বেন্ট উডের পাশের স্টেশনে গেলে কেমন হয়? কিন্তু এখানেও আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেল না। অবশেষে একজন লোক বলল–আমি চিনতাম।

পঞ্চাশের কাছে বয়স লোকটির, মজবুত স্বাস্থ্য, গায়ের রং কালো।

–চিনতাম কেন বলছেন? পোয়ারো লোকটার কাছে একটা সস্তা দামের সিগারেট এগিয়ে দেয়।

–লোকটি খুশী হয়–আসলে অনেক আগের কথা তো আর ও তো বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই?

–না।

কবে মারা গেছে?

–বছর পনেরো।

–ও কি এই গ্রামের লোক?

-না, পাশের গ্রামের। ও আমায় বলেছে আর গ্রামে যাবো না–আপনার জমির সন্ধান পেলাম, এখানেই কাজ করব।

-জোন্স আপনার জমি নিল?

দুবিঘা নিল। দামও বেশ ভালোই দিল। ঐ যে সামনে একটা একতলা পাকাবাড়ি দেখছ, তারপরই খানিকটা ফাঁকা জায়গা তারপরই ওর জমি।

-এখন ওর জমি কে দেখাশোনা করে?

–ওর এক ভাই।

–ওর সঙ্গে কী একটা মেয়ে আছে?

–হ্যাঁ আছে, ওটা কী ওর মেয়ে? আমার তো বিশ্বাস হয় না।

–বোধ হয় ওর। তা সে মেয়ে কোথায়?

–ও আসার পরে তো আর দেখি না।

–জোন্স কীভাবে মারা গেল?

–হার্ট অ্যাটাক।

–তোমায় অনেক ধন্যবাদ।

.

সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় গিয়ে পোয়ারো নিজের পরিচয় দেয়। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলে ওঠে–বসুন স্যার, আপনার জন্য কী করতে পারি?

-আপনি ফোর্স নিয়ে এক্ষুনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়ে। তরুণ অফিসার বলে–স্যার আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।

–আরে না না, যার কাছে যাচ্ছি, আমরা সেখানে অতীতের অনেক কিছু টেনে বার করতে পারবো আশা করি। আর এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

–নিশ্চয়ই স্যার। আমায় যেমনটি বলবেন আমি তেমনটি করব।

-ওখানে গিয়ে আপনার প্রধান কাজ লোকটার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবেন যে, লোকটা যাতে ভয় পায়।

–কেন স্যার?

কারণ ঘটনাটা দীর্ঘ পনেরো বছর আগের। তথ্য বলতে কিছুই নেই। জেরায় জেরায়, ভয় দেখিয়ে যদি কিছু বের করা যায়।

ইতিমধ্যে ওরা বাড়ির সামনে উপস্থিত হয় এবং বাড়িটা চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। বাড়িটার একতলায় দুখানা ঘর। বাড়ির সামনে বাগান মতোন।

ঘরের দরজা বন্ধ, ঘরের লাইট জ্বলছে। সম্ভবত ঘরে কেউ আছে।

পুলিশ অফিসার জন আর পোয়ারো চোখাচোখি হলে অনেক কথা হয়ে যায়। তারপর জন দরজায় টোকা দেয়।

–কে? এক পুরুষ কণ্ঠস্বর।

–আমরা এই বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

-কে আপনারা, বলে একজন দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ দেখে এতটুকুও বিচলিত হয় না।

পোয়ারো বার্টের দিকে তাকায়, বয়স পঁয়ত্রিশ, বেশ মজবুত স্বাস্থ্য, গায়ের রং তামাটে।

বার্ট বেশ ক্রুদ্ধভাবে–আপনার কাকে প্রয়োজন?

–তোমাকে। জন দৃঢ়ভাবে জানায়।

–আমাকে? কিন্তু...

–জোন্স কোথায়?

–জোন্স, সে কে?

–তুমি তাকে চেনো না?

–না।

–আচ্ছা, তুমি কী বরাবর এই গ্রামেই থাকো?

–হ্যাঁ।

–তার কোনো প্রমাণ আছে?

–আছে। এই জমি-বাড়ি সব আমার।

–এটা কী আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি?

–হুঁ।

-না, পোয়ারো বেরিয়ে আসে। জোন্স যার কাছ থেকে জমি কিনেছিল তাকে দেখিয়ে বলে–একে চেনো?

-হ্যাঁ। বার্টের মুখটা কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আবার ভাবে ভয়ের কী আছে?

–এবার বল, জোন্স কোথায়?

মারা গেছে; আমি একটু আসছি।

–পালাবে? বাড়ির চারপাশে পুলিশ আছে।

–কিন্তু আপনারা এসেছেন কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

–তুমি সব স্বীকার করো, নইলে পুলিশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো।

–আমি কিছু জানলে তো স্বীকার করবো। বেশ জোর গলায় বলে।

–স্যার, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

–তাই তো দেখছি। এখান থেকে ভিড় সরাতে হুকুম দিন।

সঙ্গে সঙ্গে জনের নির্দেশে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কিছু কৌতূহলী জনতা অদূরে আগ্রহ ভরে দাঁড়িয়ে রইল।

বার্টকে জিজ্ঞাসা করেও যখন সে মুখ খুলল না তখন তাকে থানায় নিয়ে গেল। তারপর সার্চ করা হল, পাওয়া গেল–কিছু টাকা, কয়েক বোতল ব্র্যান্ডি লিকার আর রবার্টের পরিবারের একটা ছবি। পোয়ারো যার সাথে মেরী বা শার্লটের কোনো মিল পাওয়া গেল না।

স্থানীয় থানা, কনফেসন রুম, এ ঘরে চারজন লোক রয়েছে–পোয়ারো, বার্ট, জন এবং সহকারী এলবার্ট। বার্ট এখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। তার উপর কয়েকদিন ধরে বেশ অত্যাচারে দারুণ কাহিল হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ পোয়ারোর মনে হয় বার্টকে কোথায় যেন দেখেছে। অনেক চেষ্টার পর মনে পড়ল খবরের কাগজে ও ছবি দেখেছে। এক উত্তেজিত জনতার সামনে দিয়ে পুলিশ ওকে গাড়িতে তুলছে। পরে জেনেছিল–ছেলেটা কয়েকটা খুনের ব্যাপারে জড়িত। কিন্তু জোন্সের সাথে বার্টের সম্পর্ক হলো কী করে? বার্ট হলো শহরের একজন উঠতি মস্তান। আর জোন্স হল গিয়ে... একেই বলে পৃথিবীর বিচিত্র নজির। যা আগে কিছুই বোঝা যায় না। পোয়ারো আবার ভাবে সেদিনের সেই ছবির সেই তো নায়ক? নাকি সে চিনতে ভুল করেছে। মনকে নাড়া দিতে থাকে। হা এই সেই ছেলে। ওদিকে নির্যাতনে বার্ট হাঁফাতে থাকে এবং বলে-স্যার সব বলছি, আগে একটু জল। মরে যাচ্ছি।

-জল দেবো, তার আগে সব বলবে বল?

পোয়ারো গ্লাসটা তুলে ধরে-নইলে গ্লাসের জল বাইরে ফেলে দেবো।

-না না! জল ফেলে দেবেন না; সব বলছি।

–এই নাও জল।

জল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বার্ট বলে–না না, আমি কিছু জানি না, ওরা আমায় এমনি ধরে এনেছে। আমি মানহানির মামলা করবো।

–তাহলে আবার তোমার উপর অকথ্য অত্যাচার করা শুরু হবে। পোয়ারো বেল বাজায়।

দৈত্যের মতো মেক্সিকান লোকটার মারের কথা চিন্তা করে বার্ট বলে ওঠে-না না! বলছি, সব বলছি।

তারপর সে সব স্বীকার করতে বাধ্য হল।

.

২৭.

ডিনসমেড একটু আগে অফিসে এসেছে। বাচ্চা মেয়েটার জন্য সত্যিই সে বিচলিত। জোন্স যে এভাবে তাকে ফাঁকি দেবে সে আদৌ কল্পনা করতে পারেনি। জোন্সের হাতে পড়ে মেয়েটার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে। রবার্ট তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সে মারা যায়। তার মেয়েটা ভেসে গেল। অথচ আপদে-বিপদে সে রবার্টের কাছ থেকে কত সাহায্য পেয়েছে। যা করে হোক জোন্সকে খুঁজে বার করতে হবে নইলে সারা জীবন মরমে মরে থাকবে।

কিন্তু আবার খুঁজবে বললেই তো হবে না, তাকে কোথায় আর খুঁজবে? আবার পিছিয়ে পড়লেও তো চলবে না। এই ভাবে ডিনসমেড ঐ গ্রামের উদ্দেশ্যে আবার বেরিয়ে পড়ে। আশেপাশের গ্রাম খুঁজতে খুঁজতে জোন্সের দেখা হয়ে যায়। কিন্তু ডিনসমেড না রেগে শান্তভাবেই তাকে জিজ্ঞাসা করে–আরে জোন্স। তুমি?

-আপনি আমার খোঁজে এখানেও এসেছেন?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

-আরে এসব কথা পরে হবেখন। আগে আমায় একটু বসতে দাও, আমায় অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে।

–ঘরে বসুন।

বাচ্চা মেয়ে ডিনসমেডকে কয়েকবার দেখেও চিনতে পারে না। কয়েকবার দেখে তারপর টলতে টলতে জোন্সের কোলে মুখ লুকোয়।

-ওকে দেখে কে? হাসিমুখে বলে ডিনসমেড।

–কে আবার দেখবে? আমিই।

–তুমি কখনো পারো?

–না পারার কি আছে? আগে থেকে ওর চেহারা ফিরেছে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

–চেহারা? না না ও তোমার চোখের ভুল। যাক সেকথা, এ দু-কামরার বাড়িটা তোমার, এখানে কী করছো?

–জমি কিনে চাষবাস করছি।

–তা মেয়েকে নিয়ে কেমন করে চাষবাস করছ?

–একটা লোক রেখেছি। সেটা যেমন চোর তেমন ফাঁকিবাজ।

–চাষবাস করা আর মেয়েকে দেখাশোনা করা একভাবে চলতে পারে? এখানে একটা ভালো স্কুল পর্যন্ত নেই। তারপর রবার্টের মেয়ে বলে কথা।

–মোটকথা এ মেয়েকে আমি দেবো না। একদিন বয়স থেকে দেখে আসছি।

–অস্বীকার করছি না। কিন্তু বাচ্চা তো বাবা মার কত আদর চায়। আমার সংসারে গেলে ও সব পাবে আর মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে। রবার্টের বন্ধু হিসেবেও তো আমার কিছু কর্তব্য আছে।

–ওসব তথ্য বুঝি না। আমি মেয়েকে দেবো না।

–তাহলে আমি পুলিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবো।

–পুলিশের কাছে যাবেন যান। বারণ করছি না তো।

–তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ? ডিনসমেড জানে থানায় গেলে সে বাচ্চাকে পাবে না, কারণ বাচ্চা তাকে দেখে ভয়ে কাঁদতে থাকে।

-বলতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি ঐ অনুরোধ করবেন না।

–তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেবো।

–পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে আমি মেয়েকে দিতে পারব না। আমি অতটা পিশাচ নই।

–আরো পাঁচ হাজার দিচ্ছি।

–আমি এক পয়সাও চাই না।

–জোন্স প্লিজ।

-আমি আপনার কথা রাখতে পারব না এবং আপনি এখান থেকে চলে গেলে আমি খুশী হবো।

–ঠিক আছে, দেখি কেমন করে ও মেয়ে তোমার কাছে থাকে। ডিনসমেড জানে এটা একটা বৃথা আস্ফালন।

ডিনসমেড চলে আসে। মেয়ের জন্য সে দারুণভাবে উতলা হয়, দিশেহারা হয়ে অফিস ঘরে পায়চারী করতে থাকে। হঠাৎ দেখে দরজার সামনে বার্ট এসে দাঁড়ায়।

বার্ট এ পাড়ার উঠতি মস্তান। হিপিদের সঙ্গে মিশে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একবার তার কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে একশো টাকা নিয়ে গেছে। কুড়ি বছর বয়স হবে বার্টের, মজবুত স্বাস্থ্য, লম্বা লম্বা দাড়ি, গোঁফ, চুল।

–আপনার সঙ্গে দরকার ছিল। আমার একটা চাকরি চাই।

চাকরি? ডিনসমেডের মাথায় হাত।

–হ্যাঁ।

–ব্যাবসা লাটে উঠতে চলেছে।

–যে কোনো কাজ করতে রাজী। পুলিশ এসে আমায় টানা-হ্যাচড়া করে, এ আর ভালো লাগে না। এছাড়া, কয়েকবার জেলও খেটেছি।

তবু ডিনসমেড না না করতে করতে হঠাৎ জোন্সের কথা মনে পড়ে যায়। তাই বলে একটা লোককে শায়েস্তা করতে পারবে?

–পিরবো। কত টাকা দেবেন?

–পাঁচশো টাকা দেবো।

–আমি রাজী। কাজটা কী?

তারপর সত্যি মিথ্যে দিয়ে সাজিয়ে একটা ঘটনা তাকে বুঝিয়ে বলে, ঐ মেয়েকে আমার চাই।

–ঐ মেয়েকে চান? তাহলে তো পাঁচশো টাকায় হয় না।

–তা কত লাগবে?

দশ হাজার দিতে হবে। আর মনে হচ্ছে ওর মধ্যে আর কিছু ঘটনা লুকোনো আছে।

–আবার কী থাকবে?

–আছে নইলে...। থাক কত দেবেন বলুন?

–হাজার টাকার বেশি দিতে পারব না।

শেষে দুহাজারে রফা হল। জোন্সের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বার্ট বেরিয়ে পড়ল।

একদিন বার্ট সেখানে গিয়ে দেখে আসে কোথা দিয়ে ঢুকবে আর কোথা দিয়ে পালাবে।

তিন দিন পরে একদিন বার্ট সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বেশ একটা কালো ভাব চারদিকে ছেয়ে আছে।

ওদিকে জোন্স ভাবে ডিনসমেড নিশ্চয়ই আবার আসবে। শুধু কী মেয়ের প্রতি কর্তব্য না অন্য কোনো রহস্য। হয়তো মেয়েটার মায়ায় পড়ে গেছে।

কিন্তু এই মেয়েকে ছেড়ে তো সে বাঁচবে না। এই মেয়ে তো তার ধ্যানধারণা।

ডিনসমেডের চিন্তা করতে করতে জোন্স একটা শব্দ শোনে। শব্দটা কোথা থেকে এলো? আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই। বাড়ির একদিকে বুনো লতা আর অন্যদিকে কাটা ঝোঁপঝাড়ে ভর্তি।

আবার একটা পায়ের শব্দ। কে যেন বাড়ির পেছনের দিকে উঠল। ওখানে একটা ছোট্ট লোহার সিঁড়ি আছে–ছাদে ওঠা যায়।

সেদিকে তাকাতেই একজনের অস্তিত্ব টের পায়। সে বোঝে হয় চোর না হলে ডিনসমেডের দূত। চোর না, তার কাছে কীই বা আছে? তাই যে চোর আসবে? নিশ্চয়ই ডিনসমেডের লোক। মেয়েকে আঁকড়ে ধরে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল জোন্স। পাথর বার্টের মাথায় না লেগে হাতে লাগল। সে বেশ আঘাত পেল এবং আঁ শব্দ করে ছাদ থেকে নেমে দৌড়ে পালায়, ভাবে লোকটা ডাকাত নয়তো খুনে। কাজটা কৌশলে করতে হবে। বার্ট এসে ডিনসমেডকে জানায় চিন্তার কিছু নেই একটা উপায় নিশ্চয় বের হবে। দরকার হলে লাসও ফেলে দেবে।

-লাস ফেলে দেবে? না না ওকাজ করো না।

আপনি কিছু ভাববেন না। ও আমার বাঁ হাতের কাজ। সঙ্গে আমার এক বন্ধুকে নেবো।

-সে বিশ্বাসী? সে কী করে?

–হ্যাঁ বিশ্বাসী। ওর বাবা মরে যেতে একটা ল্যাবোরেটরিতে কাজ পেয়েছে।

ল্যাবোরেটরিতে? ওর কাছ থেকে আর্সেনিক জোগাড় করতে পারবে? সেটা বিষ।

ডিনসমেড বার্টকে বলে–এখন থেকে দাড়ি গোঁফ কাটবে না। তারপর কিছুদিন গেলে জোন্সের কাছে হাতে পায়ে ধরে কাজ চাইবে। বলবে সব কাজ করতে পারো। ওর

একটা কাজের লোকের দরকার। ওর কাছে থেকে ওর খুব তোয়াজ করবে আর প্রতিবার মদের সঙ্গে কিছুটা করে আর্সেনিক মিশিয়ে মিশিয়ে স্লো পয়জন করে মেরে ফেলবে। এতে কোনো সন্দেহ হবে না। সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না।

বার্ট আরো তিন হাজার টাকা চায়। ডিনসমেড তাতেই রাজী, তবে সে কাজ চায়। বার্ট তাকে আশ্বস্ত করে।

মাসখানেক পর বার্ট জোন্সের কাছে যায়। দেখে সে ক্ষেতে কাজ করছে আর মেয়েটা পাশে বসে মাটি নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। বার্ট জোন্সের কাছে গিয়ে করুণভাবে বলে–আমায় একটা কাজ দেবেন?

–এ বাজারে কাজ কী অত সহজে পাওয়া যায়?

–আমায় একটু জল দেবেন। বলেই মাটিতে পড়ে যায়।

-কী হল? পাশের ক্ষেত থেকে সকলে ছুটে আসে–কী হয়েছে। কী হয়েছে। বেঁচে আছে। তো?

-দেখ না ভাই, কাজের কথা বলতে বলতে একটু জল চাইল তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেল।

তারপর একজন ডাক্তার এসে বলল যে অনাহারে এমন হয়েছে, এতে ভয়ের কিছু নেই। খাবার দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। সবাই তাকে ধরাধরি করে জোন্সের বাড়ি নিয়ে গেল। আর তখন থেকেই সে ওখানে রইল।

প্রথমটা জোন্স বার্টকে বিশ্বাস করেনি। মেয়েকে ওর কাছে একা রাখত না এবং সন্দেহের চোখে দেখত।

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে বার্ট মেয়ের মন জয় করে নেয় এবং মধুর ব্যবহারের জন্য জোন্সও তাকে আর সন্দেহ করে না। এটাই হল চরম একটা ভুল।

এখন তো সংসারে বার্ট না হলে কোনো কাজই হয় না। ফলে জোন্স বিশ্রাম নিতেও পারছে, আবার আগের তুলনায় জমির আয়ও বেড়েছে। এতে জোন্স মহাখুশী। এখন সন্ধ্যে হলেই ঘরে মদের আসর বসে। জোন্সের একগ্লাসের বন্ধু এখন বার্ট। সারাদিন পরিশ্রমের পর মদ না হলে যেন চলেই না। বার্ট সঙ্গে যে আর্সেনিক নিয়ে এসেছিল তা একটু একটু করে মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগল। দুপুরে যে খাবার নিয়ে যেত তাতেও মেশাতে লাগল।

একদিন মাঠে কাজ করতে করতে জোন্স যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। চটজলদি ডাক্তার নিয়ে এল বার্ট। ডাক্তার জানালো হার্ট অ্যাটাক, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তাই করা হল। সকলে বার্টকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। সাপে বর হল। তাকে আর কেউ সন্দেহ করবে না। দিন কুড়ি পর জোন্স হাসপাতাল থেকে ফিরে এল তবে তার আর আগের সেই শক্তি নেই।

জোন্স বাড়ি ফিরতে বার্ট নিশ্চিন্ত কারণ তার ভয় আর্সেনিকের কথাটা যদি বেরিয়ে পড়ে।

তবে এভাবে জোন্সকে মেরে ফেলার পেছনে বার্টের স্বার্থ আছে। একদিকে সে যেমন টাকা পাবে তেমনই অন্যদিকে জোন্সের অবর্তমানে এই জায়গা জমির মালিক সেই হবে। মিঃ ডিনসমেডের সঙ্গে কথা হয়েছে। সে এসব জিনিসে হাত বাড়াবে না, বাড়ালেই খতম। গুণ্ডামী, বদমায়েশী, থানা, পুলিশ এ জীবন বার্টের আর সহ্য হচ্ছে না।

তারপরেই একদিন সকালে উঠে বার্ট দেখল জোন্স কথা বলছে না। গা ঠেলতে গিয়ে দেখল গা বরফের মতো ঠান্ডা।

সঙ্গে সঙ্গে বার্ট আশেপাশের দু-একজনকে ডেকে ডাক্তারের কাছে ছোটে। বৃদ্ধ ডাক্তার, চোখে তেমন ভালো দেখে না। কিন্তু গ্রামের সেই ভরসা।

বার্ট আসতে আসতে ডাক্তারকে বলল যে, সে যদি জোন্সকে বাঁচিয়ে তোলে তাহলে তাকে বার্ট পুষিয়ে দেবে। শুনে ডাক্তার খুবই খুশী। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে আমার আর কিছু করার নেই ও মারা গেছে।

বার্ট কাঁদো কাঁদো গলায় মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে, ডাক্তার বলল–হার্টফেল করেছে।

–আপনি আর কী করবেন! বলে বার্ট ডাক্তারকে একটা একশো টাকার নোট দিয়ে বলল –আমি এখন কী করব?

সবাই সান্ত্বনা দেয়–এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। মেয়েটাকে তো দেখতে হবে।

.

২৮.

বার্টের জবানবন্দী শেষ হলে পোয়ারো বলে–মিঃ জন, টেপটা বন্ধ করে দিন। ডিনসমেডকে অ্যারস্ট করতে হবে।

-হা কিন্তু এতোদিনের পুরোনো ঘটনা টেনে বার করলেন কিভাবে?

–এখনো পুরোটা হয়নি, আরো বাকি আছে। এখন বলব না, কারণ, অনুমান ভুলও হতে পারে।

তারপর জন তার সহকারীদের জরুরী নির্দেশ দিয়ে পোয়ারোকে নিয়ে তার অফিসে যায়। পোয়ারোকে বসতে বলে জন রিসিভার তুলে নেয়।

-হ্যালো!

–আমায় একটু গ্রীন উড থানার লাইনটা দিন না। এক্ষুনি ভীষণ দরকার।

একটু পরেই লাইন বেজে ওঠে। জন রিসিভার তোলে।

-হ্যালো।

–স্যার অনেকবার ট্রাই করলাম, কোনো রেসপন্স নেই?

বারবার ট্রাই করে যাও।

ইতিমধ্যে ওদের কফি এসে গেছে। পোয়োরো কফিতে চুমুক দিয়ে বলে–মিঃ জন, বার্টের দিকে একটু বিশেষ নজর দেবেন। কারণ ও আমার প্রধান সাক্ষী হিসাবে কাজ করবে। আর টেপটাও সাবধান।

কিন্তু পোয়ারো নিজেও কথাগুলো একটা ছোটো টেপ রেকর্ডারে টেপ করে নিয়েছে। পুলিশের লাইন। টাকা পেলে দিনকে রাত বানানো খুবই সহজ ব্যাপার। অবশ্য কয়েকটা দুষ্টু লোকের জন্য এই কথা বললাম। বার্ট দাগী আসামী, ছলচাতুরীতে পারদর্শী। তাই জনের উপর পোয়ারোর পুরোপুরি ভরসা নেই তার ওপর পাড়া গ্রামের থানা। একবার পালালে ধরা মুশকিল।

ইতিমধ্যে ফোন বেজে ওঠে। জন রিসিভার তুলে নেয়–হ্যালো!

–স্যার লাইনটা পেয়েছি। স্পিক হিয়ার প্লিজ।

-থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যালো! গ্রীন উড থানা? আমি অফিসারের সাথে কথা বলতে চাই। আমি থিয়েটো থানা থেকে বলছি।

ধরুন।

–হ্যালো! অফিসার বলছেন?

–হ্যাঁ।

–আপনি গ্রীন উডের মিঃ ডিনসমেডকে চেনেন?

–ডিনসমেড? হা হা, চিনতে পেরেছি। একটা বাংলো বাড়ির মালিক।

তাকে অ্যারেস্ট করুন।

–অ্যারেস্ট করবো? কিন্তু তার বিরুদ্ধে চার্জ কী?

–অনেক চার্জ আছে। নিশ্চয়ই এরকুল পোয়ারোর নাম শুনেছেন?

–তা নিশ্চয়ই।

–তিনি এ বাপারে ইনভেস্টিগেশন করছেন।

–তাহলে তো এক্ষুনি মিঃ ডিনসমেডকে অ্যারেস্ট করতে হয়।

–হ্যাঁ, তাই করুন।

–আপনার নামটা?

–জন। আর আপনার?

–স্টিফেন।

–আর শুনুন, অ্যারেস্ট করেই আমায় খবর দেবেন। মিঃ পোয়ারো খুব চিন্তায় আছেন।

-স্যারকে চিন্তা করতে বারণ করুন। মিঃ ডিনসমেড এ চত্বরে থাকলে নিশ্চয় অ্যারেস্ট হবেন।

–ঠিক আছে ছাড়ছি।

–পোয়ারো এখান থেকে বেরিয়ে চারদিক ভালো করে দেখে একটা বুথে ঢুকে ডায়াল করে।

–হ্যালো মিঃ এমিট।

–হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?

–আমি পোয়ারো।

–গুড মর্নিং স্যার।

–গুড মর্নিং, আপনাকে আমার এখন ভীষণ দরকার।

–বলুন স্যার, কী কাজে লাগতে পারি?

–আপনি এক্ষুনি একবার থিয়েটা থানায় আসবেন?

–থিয়েটো মানে....

–হ্যাঁ, ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার পথ।

–স্যার, আপনি ওখান থেকে কথা বলছেন?

-হ্যাঁ, এখানে এসে আমার দেখা পাবেন না। ছদ্মবেশে আসবেন, ভালো করে শুনুন, আপনার কী করতে হবে।

-বলুন স্যার।

বার্টের বিবরণ দিয়ে পোয়ারো বলে–এ থানায় আছে। দারুণ একটা চীজ। কাল ওকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনাকে দেখতে হবে ও যাতে পালাতে না পারে আর পালালে কোথায় যায় সেদিকে নজর রাখবেন। সুতরাং সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

-ইয়েস স্যার।

–আর পালালে স্থানীয় থানায় যেমন জানাবেন আমাকেও জানাতে ভুলবেন না।

–ঠিক আছে স্যার, ছাড়ছি।

–আচ্ছা।

.

২৯.

–হ্যালো।

–হ্যালো। চার্লস, আমি পোয়ারো!

–সেটা বলতে হবে না। কিন্তু তুমি এখন কোথা থেকে বলছে?

–থিয়েটা। শোনো তোমার কী আজ অফিস যাবার খুব দরকার?

–কেন বলো তো?

-তোমায় এক্ষুনি একবার মিঃ ডিনসমেডের বাড়ি যেতে হবে। গিয়ে দেখবে মিঃ ডিনসমেড অ্যারেস্ট হয়েছে কী না?

–অ্যারেস্ট? মিঃ ডিনসমেড?

–হ্যাঁ।

–কিন্তু কেন?

–মিঃ রবার্টের মেয়েকে নিজের হেফাজতে রাখার জন্য।

–তাতে কী হয়েছে? বন্ধুর নিঃস্ব মেয়েকে..

–সে যে জোন্সকে হত্যা করে...

–মিঃ ডিনসমেড?

–না, সে নয়, লোক লাগিয়ে কাজ করিয়েছে।

কাকে দিয়ে?

–তাকে তুমি চিনবে না। শোনো তোমার এখন অনেক কাজ।

তার আগে আমায় একটু ধাতস্থ হতে দাও। তোমাদের ডিটেকটিভের ধাঁধা যে বড়ো জটিল।

–তোমার ধারণাই ঠিক। মেরী আর শার্লট দুই বোন নয়।

–কে ডিনসমেডের মেয়ে?

-সেটা এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে মিস জুলিয়েট, মিসেস ম্যাকডোনাল্ড আর মিঃ হেনেসের কথায় মেরী নামের কিছু মিল পাওয়া গেছে। তবে...। আমার মন অন্য কথা বলছে।

-কী বলছে?

–সম্ভবত শার্ট ডিনসমেডের মেয়ে নয়।

কারণ ওঁর মাথায় পরচুল আছে, তাই?

-তা ঠিক নয়। ঐ মেয়েকে নিয়ে ডিনসমেড গ্রীন উড়ে পালিয়ে এসেছে, যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

–যেই রবার্টের মেয়ে তোক ও নাম তাদের আসল নাম নয়।

–হঠাৎ একথা বলছ?

–সব সন্দেহের অবসান মিঃ ডিনসমেড ঘটাতে চেয়েছে। আর এস. ও এস.-এর মধ্যে অনেক কিছু লুকানো আছে।

-যেমন?

–দুবোন কিছু একটা আঁচ করেছিল অনেকদিন ধরে ওদের বাবা-মার কথায়। নইলে তাদের অজান্তে এস. ও. এস. লিখত না। এক্ষেত্রে তাদের অবচেতন মন খেলা করেছে।

–আর আমার মনে হয় ওখানে সত্যি কোনো বিপদ ঘটতে চলেছে।

–তুমি কোন বিপদের কথা ইঙ্গিত করছ?

—মৃত্যুর।

-কার মৃত্যু?

–তা সঠিক বলতে পারছি না। মেরী নয় শার্লট।

–নিজের মেয়ের কথা ছেড়ে দাও, বন্ধুর মেয়ে ও তো। আর সেখানে বলছ কী না...

-হ্যাঁ বন্ধু সেটাই রহস্য। বড়ো বিচিত্র এ জগৎ। কেন ডিনসমেড বন্ধুর মেয়েকে পাবার জন্য এত লালায়িত হয়ে উঠেছিল? শুধু কী বন্ধুর মেয়েকে কাছে পাবার জন্য? আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলছে।

–সেটা কী?

—লোভ, সম্ভবত অর্থ, সেটা প্রায় সময়ই অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন না পারে গিলতে পারে ওগরাতে। ফলে নিজের বেছানো জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে। সেটাই ক্লু খেলে যায়।

-হ্যাঁ। সত্যিই তো মেয়ে পাবার জন্য অত কাঠখড় পোড়াতে যাবে কেন?

–শোন তুমি যদি ওখানে গিয়ে দেখ মেরী আর শার্লট ঠিক আছে তাহলে কিছু করার নেই।, তবু একজন ডাক্তার দেখিয়ে ওদের চেকআপ করিয়ে নিও।

-চেকআপ করাবো? একথা বলছ কেন? এদের মধ্যে কে অসুস্থ হতে পারে?

–এদের দুজনের মধ্যে একজন এবং সত্যিই তার বিপদ।

–কে?

–ডিনসমেড নিজের মেয়েকে রবার্টের মেয়ে বলে চালাতে চাইবে। ফলে অন্য জনের ঘটবে বিপদ।

–রবার্টের মেয়ে? তাতে ডিনসমেডের লাভ?

–লাভ তো বটেই হয়তো টাকা পয়সার প্রশ্ন জড়িতে আছে। আর রবার্টের মেয়ে নিশ্চয়ই অতগুলো টাকার লোভ ছাড়তে পারবে না। সেদিক দিয়ে নিজের মেয়ে হলে স্বস্তি।

–হয়তো তাই।

–তোমার মনে আছে, ডিনসমেউ কয়েক মাস অন্তর মেরীকে নিয়ে কোথায় যেন যেত। সেই ব্যাপারে মেরীকে প্রশ্ন করলে সে বলত রাস্তাটা সে গুলিয়ে ফেলেছে। প্রথমবার বাবা একই রাস্তায় অনেকবার ঘুরিয়েছে, তারপর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করিয়ে তাকে পাশের ঘরে যেতে বলেছে। আবার ফেরার সময় ঘুরপথে বাড়ি ফিরেছে। এখন প্রশ্ন সেই বৃদ্ধ লোকটি কে যার জন্য মিঃ ডিনসমেডের এত লুকোচুরি খেলা। আর মেরী বলেছিল বৃদ্ধ লোকটি হয়ত লইয়ার কারণ তার বাড়িতে অনেক মোটা বই সে দেখেছে।

-সলিসিটারও হতে পারে।

-হা, ওখানে রবার্ট হয়তো টাকা গচ্ছিত রেখেছে যেটা ডিনসমেড জানত। আর শোন ওখানে গিয়ে দেখবে টম নাম একটা ছেলে কাজ করছে। তুমি ঘন্টা চারেক পর ওকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলবে।

–ঠিক আছে।

পোয়ারো ঘণ্টা তিনেক পর বাড়ি ফিরে ডিনসমেডের স্থানীয় থানায় ডায়াল করে–হ্যালো।

–গ্রীন উড থানা?

–হ্যাঁ।

মিঃ ডিনসমেড অ্যারেস্ট হয়েছে?

–গুড মর্নিং স্যার, মিঃ ডিনসমেডকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

–ঠিক আছে তাদের বাড়ির সবাই ভালো?

–হ্যাঁ স্যার, তবে ওদের বাড়িতে একটা ছেলে কাজ করতো, সে মিসিং।

–মিসিং? পোয়ারো বুঝল তবু অবাক হবার ভান করল।

–হ্যাঁ স্যার, আর মিঃ ডিনসমেড অ্যারেস্ট হবার পেছনে কী চার্জ আছে তা যদি জানতাম...।

–এখন একটু অসুবিধে আছে তবে লোকটি মোটেই সুবিধের নয়।

অথচ স্যার, দেখলে বোঝাই যায় না।

–আপনি তাকে চেনেন নাকি?

–আমার কাছে মাঝেমধ্যেই আসতেন।

–একা?

–না স্যার, তার সঙ্গে তার মেয়ে শার্লট আসত।

–মেরী নয়তো?

–না স্যার, আমি চিনি।

–আপনার কাছে মিস শার্লটকে নিয়ে আসত কেন?

–যাতে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

—শার্লট এসেছিল কী?

–না স্যার।

–আপনি কী শার্টকে ভালোবাসেন?

–ওর মনের কথা জানতে পারি না।

–শার্লটের কোনো প্রেমিক আছে? একটু খোঁজ নেবেন?

প্রয়োজন আছে?

–কথাটা এমনই বললাম। সে ভাবে, শার্লট রবার্টের মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেলে ল্যাটা চুকে যেত। তার পর পুলিশের চাকরি। একটা তোফা চাল চেলেছিল ডিনসমেড। আর শার্লটকে কেন্দ্র করেই অফিসারকে হাত করেছিল। তবু শেষ রক্ষা করতে পারল না। পাপ কাউকে ছাড়ে না। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

–আর স্যার, আমাকে মিঃ ডিনসমেড মাঝেমধ্যেই নিমন্ত্রণ করতেন। তখন একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম। তখন মিস শার্লট ছাড়া বড়ো একটা কেউ কাছে আসতেন না।

পোয়ারো ভাবে একেবারে শেষ সময় তাকে হার স্বীকার করতে হল। ওর মধ্যে হয়তো টাকার ব্যাপার রয়েছে। ইস্ তার বাড়া ভাতে এভাবে ছাই পড়লো। আর যত গণ্ডগোল বাঁধাল চার্লস। সে ঝড় জলের রাতে গ্রীন উড থেকে মেরী শার্লট সংবাদ পরিবেশন করে আমার মনে সন্দেহের জাল বুনে দিল। যার মূলে রয়েছে–এস. ও. এস.।

আতঙ্কের চিহ্ন

৩০.

পোয়ারো রিসিভার নামানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় টম দারুণভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল। তার মুখে একটা আতঙ্কের চিহ্ন।

পোয়ারো তাড়াতাড়ি উঠে টমের কাছে আসে।

পোয়ারো বলে–টম তুমি একটু বিশ্রাম কর আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।

এই বলে পোয়ারো কিচেন থেকে কয়েকটা শুয়োরের স্যান্ডউচ আর দুধে কিছুটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে নিয়ে আসে।

টম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। পোয়ারো নিজের কৌতূহল দমিয়ে রেখে টমকে খেয়ে নিয়ে তারপর কথা বলতে বলে। খাওয়া শেষ হলে টম বলে-স্যার আপনাকে আগে একদিন ফোনে বলেছিলাম, মিস শার্লটের জুতোয় একটা বড়ো পেরেক উঠেছে।

-হ্যাঁ, সে পরে গিয়ে তুমি সারিয়ে নিয়ে এসেছিলে।

-এরপর দেখা গেল মিস শার্লটের জুতোয় আরো কয়েকটা পেরেক বেরিয়ে পড়েছে। তাতে তার বড়ো লাগছে। সে আমায় ডেকে বললো, টম, আবার পেরেক বেরিয়েছে তুমি কী সারালে?

-তারপর?

–আমি বলি, মিস শার্লট আমি তো মুচিকে ভালো করেই সারাতে বললাম। বলে আমি মাথা চুলকাই, যেন অপরাধটা আমারই।

-এবার খুব ভালো করে বলবে।

–আচ্ছা।

হঠাৎ ডিনসমেড এসে বলে–তোমায় যেতে হবে না। যতসব কারবার!

মিস শার্লট যে পড়তে পারছে না। ওনার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। আমি আমতা আমতা করে বলি।

–আমি শহর থেকে ভালো করে সারিয়ে আনবো। এখানকার মুচি ভালো না।

–সেটাই ভালো হবে বাবা।

–টম তুই জুতোটা প্যাক করে গাড়িতে তুলে দে।

–এক্ষুনি যাচ্ছি, স্যার।

ডিনসমেড সন্ধ্যের মুখে জুতো এনে শার্লটকে দেয়–এই নাও ভালো করে সারাই করে এনেছি।

শার্লট খুশী, বলে-বাবা চমৎকার সারানো হয়েছে। শহরের সঙ্গে কী গ্রামের তুলনা চলে?

তারপরই একটা ঘটনা ঘটল। শার্লট ও মেরী একই ঘরে শোয়। পাশের ছোটো ঘরে টম শোয়।

একদিন টম লক্ষ্য করে তাদের ঘরের কাছে জুতোর র‍্যাকের সামনে একটা ছায়ামূর্তি এসে জুতোর কাছে কী যেন করে আবার চলে যায়, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমন করেই।

টম কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। দরজা খুলতে সাহস পায় না, যদি ছায়ামূর্তি আবার আসে। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে ভালোভাবে দেখে নেয় কেউ তাকে দেখছে কি না আর তারপর জুতোর কাছে ভালোভাবে খোঁজে কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পায় না।

টম ঐ চাদরে জড়ানো ছায়ামূর্তির উচ্চতা আর হাঁটার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারে যে ওটা ডিনসমেড।

তারপর টম নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসে। ভাবে ওখানে কিছু একটা ঘটবেই। তাই ভালোভাবে লক্ষ্য রাখে। তা না হলে ডিনসমেড অত রাতে ওখানে আসবে কেন? হয়তো তার জন্যই পোয়ারো তাকে ওখানে রেখেছে।

টম ওঁৎ পেতে থাকে কিন্তু পরদিন তেমন কিছু ঘটল না।

এর মাঝে কয়েকদিন গেল কিছু হল না। কিন্তু দিন দশেক পরে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

–টম জানলা দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলতে গিয়েছিল, পেছন ফিরে তাকাতে দৃশ্যটা চোখে পড়ে। দৃশ্যপটের আবার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ডিনসমেড পকেট থেকে কিছু একটা বার করে জুতোর র‍্যাকের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গেল।

তারপর টম সেদিনের মতোই করল। একটা পেনসিল টর্চ মেরে জুতোর র‍্যাকের কাছে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় তার চোখে পড়ল শার্লটের জুতোর পেরেকের উপর কয়েক জায়গায় একটু জলের মতো দাগ। টম ভাবে হয়তো শিশিরের জল গড়িয়ে জুতোর উপর পড়েছে। আর ঠিক তার উপরে ছাদে ড্যামের মতো দাগ। বর্ষাকালে নাকি এখান দিয়ে জল পড়ে।

টম বিছানায় শুয়ে পড়ে। হঠাৎ মনে হয় যে ডিনসমেড় দিনের বেলা তো ওখানে যায় না তাহলে রাতে ওরকম করে ওখানে যায় কেন? যে মানুষ সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে তার তো রাতে মরার মতো ঘুমানোর কথা আর সে কী না! সারারাত সে বিছানায় পোয়ারের কথা ভাবে, কিছু ঘটবে।

তারপর টম ভাবে কাল এমন ঘটলে সে ডিনসমেডকে চোর চোর বলে জড়িয়ে ধরবে। তারপর যা থাকে কপালে। আর পোয়ারোর কাজ শেষে হলেই এখান থেকে বিদায় নিতে হবে।

টম ভাবে রহস্যের গন্ধ যখন পাওয়া গেছে তখন তো চুপ করে থাকা যায় না। একটা কিছু করতেই হবে হয় এসপার নয় ওসপার।

আবার ভাবে ডিনসমেডকে হাতেনাতে ধরা ঠিক হবে না। তাহলে সে সজাগ হয়ে যাবে, তাহলে ঘটনাই ঘটবে না।

একথা সে বাড়ির কাউকে বলবে না। তার কথায় কেউ সন্দেহ করুক সে চায় না।

জর্জ হয়তো কাউকে বলবে না। সে টমকে ভালোবাসে। শার্লট কাউকে বলবে না। সে ভালো মেয়ে। আর একটা ব্যাপার সেই র‍্যাকে জর্জ, মেরী আর শার্লটের জুতো থাকে। শার্লটের জুতো থাকে একধারে। ছায়ামূর্তি সেই ধারেই প্রত্যেকদিন কী করে?

যাক, তারপর দিন টম উঠে ঘরের কাজকর্ম সেরে ডিনসমেড অফিস বেরিয়ে যেতে একটা প্লাসটিক কভারে খবরের কাগজ জোগাড় করে টেবিলের উপর রেখে দেয়। যাতে কেউ তাকে সন্দেহ না করে।

তারপর রাতে একই ঘটনা ঘটল। টম শার্লটের জুতোর পেরেকের উপর জলের দাগ দেখল। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল সেই দাগে এক ফোঁটা জল নেই। আর বৃষ্টিও হয়নি। টম শার্লটের জুতোর পাটিটা নাকের কাছে তুলে ধরে, কেমন যেন একটা গন্ধ। তারপর টম দ্রুত প্লাসটিকের কভারে খবরের কাগজের মধ্যে শার্লটের জুতোর পাটিটা পেঁচিয়ে নেয় আর ভোরের প্রতীক্ষায় থাকে। একটু আলো ফুটলেই পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসে পোয়ারোর কাছে।

-স্যার, এই সেই জুতো।

পোয়ারো তো যা বোঝার বুঝেই গেছে। তাই নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, কই দেখি?

–এই যে স্যার বলে, টম জুতোয় হাত দিচ্ছিল।

পোয়ারো বলে-থাক ওটা আর খুলতে হবে না। ওটা বরং দরজার কাছে রাখো।

পোয়ারোর তেমন আগ্রহ না থাকায় টমকে মুষড়ে পড়তে দেখে পোয়ারো টমের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে–সাবাস টম। তোমার কাজ তুমি ভালোভাবেই করেছ।

-থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, কিন্তু আজ থেকে আমি যে আবার বেকার হয়ে গেলাম।

–সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমার ঐ কলেজেই চাকরি হবে। পিরের সঙ্গে দেখা করো; তাকে সব বলা আছে।

যাও এবার একটু কোণের ঘরে ঘুমোও আর রাস্তায় বেরোবে না।

-কেন স্যার?

–তাহলে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারো।

টম ভয় পেয়ে যায়–অ্যারেস্ট?

-হ্যাঁ, কারণ পুলিশ তোমায় খুঁজছে।

–তাহলে স্যার, আমার কী হবে?

–ধরা পড়লে দেখা যাবে।

টম শুয়ে পড়তেই পোয়ারো জুতো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সোজা হাজির হয় ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে। এখানকার মিঃ সার্টক্লিফ তাকে নানাভাবে সাহায্য করে। তিনি কী একটা টেস্টে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু পোয়ারোকে দেখেই বলেন– আরে মিঃ পোয়ারো যে।

–আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।

–বিরক্ত কী? আপনার হাতে ওটা কী?

–জুতো।

–ও, তা এবার জুতোরহস্য সমাধান। তা এটাকে কী করতে হবে? সার্টক্লিফ হাসতে থাকে।

–এর পেরেকের জায়গাগুলো টেস্ট করে দেখতে হবে ওখানে কী আছে।

–ঠিক আছে আপনি একটু বসুন, কফি খান। আমি ততক্ষণ এই জুতো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কী বলেন?

–উত্তম প্রস্তাব। পোয়ারো জানে সার্টক্লিফ খুব দক্ষ। এ কাজ সে পনেরো মিনিটে করে ফেলবে।

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে পোয়ারোর হাতে একটা রিপোর্ট দেয় সার্টক্লিফ। তাতে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ধন্যবাদ জানিয়ে পোয়ারো যেতে যেতে ভাবে তার ধারণাই ঠিক। আর্সেনিক দিয়ে শার্লটকে স্লো পয়জন করা হচ্ছিল। তাই টম বলেছিল শার্লটকে নির্জীব দেখায়। এখন পোয়ারো নিশ্চিত শার্লটই রবার্টের মেয়ে, ডিনসমেডের পালিতা কন্যা।

এবার পোয়ারোর কাছে পরিষ্কার হয় পরচুলা রহস্য। শার্লটের সোনালি চুল। যা তার পরিবারে কারো নেই। এতে লোকের সন্দেহ হতে পারে তাই ডিনসমেড ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর শার্টকে বলে তোমার সোনালি চুল দেখে বন্ধুরা ক্ষেপাবে। সে তাই বিশ্বাস করে, সে বোঝেনি এর পেছনে এতবড়ো রহস্য।

হঠাৎ পোয়ারোর মনে হয় তাহলে এতদিন ডিনসমেড শার্লটকে বাঁচিয়ে রেখেছিল কেন? হয়তো যদি কোনক্রমে ফাঁস হয়ে যায় রবার্টের মেয়ে জীবিত নয়, তবে টাকা হাতে পাবে না তাই। একদিকে শার্লটকে জীবিত রেখে মেরীকে দিয়ে কাজ হাসিল করছিল আর অন্য দিকে একটু একটু করে শার্টকে সরিয়ে দিচ্ছিল।

রবার্টের মেয়ে যে শার্লট তা সুসান জানত। কিন্তু ডিনসমেডের হত্যার প্ল্যানটা হয়তো জানত না।

পোয়ারো ভাবে রবার্টের মৃত্যুও স্বাভাবিক নয় রহস্যপূর্ণ। হয়তো এর পিছনেও ডিনসমেডের কালো হাত আছে।

একবার স্থানীয় থানায় যাওয়া দরকার। ডিনসমেডের অফিস সংলগ্ন এলাকায় হয়তো কোনো হদিশ পাওয়া যেতে পারে। যা বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয় তা অফিসে রাখলেও রাখতে পারে, কারণ অফিসে লোকের আনাগোনা কম। আর যদি সে রবার্টের ব্যাপারে জড়িত থাকে তবে রবার্টের মৃত্যু যেদিন হয় সেদিন সে নর্থ রোড স্টেশনে গেছিল এবং একজন ব্যবসায়ী তার হিসেব সে কি কাগজে কলমে রাখবে? আর রাখলেও অন্য ভাবে রাখবে। অথবা কোন সাংঘাতিক উপায় যা সে একাই বুঝবে।

রবার্ট যেদিন মারা যায় সেদিন সকালে আকাশ ভালো ছিল। দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ থেমে থেমে বৃষ্টি ঝড় শুরু হয়। পোয়ারো আগেই এসব খবর আবহাওয়া অফিস থেকে জেনেছিল।

তাই এমন দিনে বিশেষ করে লোকাল ট্রেনে লোক কম হওয়া স্বাভাবিক, এটা তার অনুমান মাত্র। পরের কথায় যৌক্তিকতা আছে কী না জানতে নর্থ রোড স্টেশনের মাস্টারের সঙ্গে কথা বলায় সে ঐ একই কথা জানিয়েছে।

এটা ডিনসমেডের কাজ কিনা জানার জন্য এবং নিঃসন্দেহ হবার জন্য তার অফিস ঘরটা খোঁজা দরকার। হয়তো ডিনসমেড নিজের অফিস ঘরেই রহস্যের চাবি কাঠি লুকিয়ে রেখেছে।

.

৩১.

পোয়ারো সেখানকার স্থানীয় থানার সামনে গাড়ি পার্ক করে রেখে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে তার ঘরে যায়।

অফিসার পরিচিত না হলেও বয়স্ক অফিসার পোয়ারার নাম জানে এবং চেনে কারণ একাজে তার যেমন অভিজ্ঞতা, তেমন ব্যাপক পরিচিত গণ্ডী। তাই সে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বলে-মিঃ পোয়ারো? আমার এখানে?

–আমায় একটু সাহায্য করতে হবে।

নিশ্চয়ই আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়েই বসে আছি।

-হিল ভিউ রোড আপনার এরিয়ার মধ্যে তো তাই না। ওখানকার একটা দোকানে সার্চ করতে যেতে হবে।

–আচ্ছা দোকানটা কী এখন ভোলা পাবো?

–এখন একটা বাজে, ভোলা থাকারই কথা।

–তাহলে একটু অপেক্ষা করুন আমি সব ব্যবস্থা করছি।

তারপর মিনিট দশেকের মধ্যে বেরিয়ে ডিনসমেডের দোকানের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখে দোকানের একটা পাল্লা ভেজানো আর দারোয়ান বেচারা টুলে বসে ঝিমচ্ছে।

-এই। অফিসার পুলিশী মেজাজে রুল দিয়ে দারোয়ানকে একটা গোত্তা মারে।

–স্যার, বলে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু ডিনসমেডের বদলে পুলিশকে দেখে ভিমরি খাবার যোগাড় এবং কাঁদো কাঁদো গলায় বলে–আমি চুরি করিনি।

–মানছি তুমি চুপি করোনি, আমরা এ দোকান সার্চ করতে এসেছি।

–ও কিন্তু এখানো..দারোয়ান ইতস্তত করে-তো স্যার আসেনি।

–অন্যদিন কখন আসে?

–এই ধরুন দশটার মধ্যে।

–যা মাইনে ঠিক মতো পাও?

–না স্যার দুমাসের মাইনে বাকি। খাতাতেও তাই আছে।

হিসেবের খাতাগুলো কোথায়?

–ঐ আলমারিতে। কিন্তু চাবি স্যারের কাছে।

–সত্যি বলছ?

–হ্যাঁ স্যার।

পোয়ারো দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে–এখানকার চাবির দোকানটা কোথায়?

কয়েকটা দোকানের পরেই।

–চাবিওয়ালাকে আমাদের কথা বলে ডেকে আনো। ওর সঙ্গে একটা পুলিশ দিন।

একটু পরেই চাবিওয়ালা মাস্টার-কি নিয়ে এল এবং একটু পরেই আলমারি খুলে দিল।

পোয়ারো দেখল আলমারিতে বেশ কিছু ফাইল ও কাগজপত্র। তবে আলমারির চারিদিকে অপরিষ্কার ও অব্যবহারের চিহ্ন জানিয়ে দিচ্ছে ব্যাবসার দুরবস্থার কথা।

এর মধ্যে কোথায় খুঁজবেন? এ তো দেখছি খড়ের গাদায় আলপিন খোঁজার মতো ব্যাপার।

-তা ঠিক তবু একবার চেষ্টা করতে হবে। পোয়ারো দারোয়ানকে বলে-মাইনে নেবার সময় কী কর?

-খাতায় স্ট্যাম্প দিয়ে সই করে মাইনে নিই।

–তাহলে তো খাতাটা চেনো। বার করো তো।

–স্যার এক্ষুণি বার করছি।

পোয়ারো ভাবে রবার্ট মারা গেছে দশই মার্চ, সোমবার। তাহলে মার্চ মাসের হিসেবটা দেখতে হবে।

এদিক ওদিক-খুঁজে একটা খাতা বার করে দারোয়ান বলে–ওটা তিন বছর আগের খাতা স্যার।

–এইরকমই পনেরো ষোলো বছরের পুরোনো খাতা তোমায় বার করতে হবে।

–ওরে বাবা।

–তবে বেশি খুঁজতে হবে না। একটা খাতায় বছর তিন-চারেকের হিসেব আছে।

–হা স্যার।

–তাহলে সেই ভাবে খোঁজ।

তারপর ময়লা ঝুলে ভর্তি একটা খাতা মুছে দারোয়ান বলে, এটা হতে পারে।

থ্যাঙ্ক ইউ। পোয়ারো একটা টেবিলে বসে বসে আগ্রহের সাথে খাতাটা দেখতে থাকে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি করে সে মার্চ মাসে এসে থমকে দাঁড়ায়। এ মাসের দশ তারিখে কী লেখা আছে সেটাই তার জানা দরকার।

পোয়ারা বেশ উত্তেজিত হয়ে দশ তারিখের ব্যয়ের জায়গাটা দেখে–একটাই হিসেব লেখা আছে–টি, এক্সপেন্টা–বাইশ টাকা দশ পয়সা। তবে পোয়ারোর তীক্ষ্ণ নজরে আরো একটা জিনিস স্পষ্ট হল–টি, একপেন্ট লেখাটা একসঙ্গে হয়নি। হয়েছে বেশ কয়েকদিন পর। কারণ দশ তারিখে যে কালির ব্যবহার করা হয়েছে তার দাগ এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দোতে নেই। পোয়ারোর মনে সন্দেহে ভরে ওঠে। এবার তাকে বাইশ টাকা দশ পয়সার হিসাব বার করতে হবে। অফিসারের দিকে তাকিয়ে–এই খাতাটা সিজ করুন।

–কিছু পেয়েছেন বুঝি?

–হ্যাঁ, আর একটা সিজার্স লিস্ট তৈরি করে দারোয়ান এবং স্থানীয় কয়েকজনকে রেসপেক্টেবল লোক দিয়ে সই করিয়ে নিন। অবশ্য আপনি একজন অভিজ্ঞ অফিসার এগুলো ভালোই জানেন।

থ্যাঙ্ক ইউ। আর দোকানটাও সিল করছি।

–হা আর একটা অনুরোধ।

এই কথাটা শুনে অফিসার লজ্জিত হয় এবং নিজেকে ধন্য বলে জাহির করে। পোয়ারো বলে-খাতাটার আট থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত একটা ফটো স্টার্ড করে নিতে। অফিসার নিজে গিয়ে তাকে দিয়ে আসবে জানায়। তারপর পোয়ারো বিদায় নিয়ে চলে যায়।

পোয়ারো গাড়িতে বসে পকেট থেকে একটা ছোটো ডায়েরি বার করে নির্দিষ্ট জায়গাটা পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো আনন্দে চিকচিক্ করে ওঠে।

পোয়ারো ভাবে ডিনসমেডই যে রবার্টের খুনী তা প্রমাণ হয়ে গেল। তার একমাত্র ক্লু ঐ টি, এক্সপেন্টা-বাইশ টাকা দশ পয়সা।

পোয়ারোর বিশ্বাস রবার্ট উঠেছে হিল রোড থেকে আর নেমেছে নর্থ রোডে। অবশ্য যদি নামতে সেদিন পেরেছিল। কারণ এর মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্টের প্রশ্ন জড়িত ছিল। হয়তো ডিনসমেড সেদিন পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছে, কিংবা কাজটা নিজেই ঘটিয়েছে।

হিল রোড থেকে নর্থ রোড এগারো মাইল দূরে আর ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া বাইশ টাকা দশ পয়সা। এটা সেদিন স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে জেনে ডায়েরিতে লেখা।

সুতরাং পোয়ারোর দৃঢ় বিশ্বাস এতে বড় ধরনের টাকার ব্যাপার জড়িত আছে। তা না হলে ডিনসমেড এতোটা বেপরোয়া হত না। সেদিনের কাণ্ডটার পেছনে কী উদ্দেশ্য আছে? আর এই রবার্টই তার প্রাণের বন্ধু।

আর সেই টাকা নিশ্চয়ই কোনো উকিল বা সলিসিটারের কাছে গচ্ছিত আছে। তাই মেরীকে নিয়ে সে প্রায়ই যেত। তাহলে মেরী ব্যাপারটা জানতে চায়নি কেন? অর্থাৎ প্রথম থেকেই অতি সাবধানে পা ফেলে এগিয়েছে।

পোয়ারো হাসে, কিন্তু ভবিতব্য? চার্লসই বা কেন সেই দুর্যোগের রাতে ডিনসমেডের বাড়িতে হাজির হবে? একেই বলে শাস্ত্রের বিধান।

.

৩২.

পোয়ারো খবরের কাগজের অফিসে উপস্থিত হয়। জানে পেনিকে পাবে না। রোজিকে পেলেই ভালো। মেয়েটা বেশ কাজের।

আরে ঐ তো রোজি বসে আছে। রোজির বয়স তেইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে, উগ্র প্রসাধন, পরনে হাল্কা গোলাপী রংয়ের মিনি স্কার্ট আর তার উপর একটা ফুল স্পীডের সাদা সোয়েটার।

–আরে রোজি যে।

–আপনাকে কিন্তু আমি মোটেই আশা করিনি। হেসে বসতে বলে পোয়ারাকে।

–তোমায় কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। ডেটিং আছে নাকি?

–উঁহু।

–বিশ্বাস হয় না। যাক আমার একটা কাজ করে দেবে?

নিশ্চয়ই কিন্তু কাজটা কী?

–শোনো, এ মাসের আট তারিখ থেকে এগারো তারিখ পর্যন্ত বাইরে ছিলাম। এর মধ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে?

–এক মিনিট। তারপর ইনডেক্স কার্ডের দিকে যায়, তারপর জানায় জন মুখ মারা গেছেন।

–ভালো হয়েছে আশি বছর ভুগে খুব কষ্ট পাচ্ছিল।

–কতগুলো হিপি শেষ রাতে বারে ঢুকে ক্যাবারে ডান্সারকে ছিনতাই করতে গিয়ে স্পটে পুলিশের গুলিতে দুজন মরে।

-ভালো হয়েছে। আর?

–ফুটবল সম্রাট পেলে বলেছেন–খেলাধূলার মান বজায় রাখতে ছোটোদের দিকে নজর দিতে হবে।

–আর কিছু?

–আর পথ দুর্ঘটনা, ছিনতাই ইত্যাদি।

থ্যাঙ্ক ইউ। সন্ধ্যের পর আসতে পারি।

–ইউ আর দি লায়ার। আগে দুবার কথা দিয়েও আসেননি।

–আই অ্যাম সো সরি। হাওয়া বেগতিক দেখে পোয়ারো তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়ে।

.

৩৩.

দুটোর সময় গ্রীন উড থানায় ডিনসমেডকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডিনসমেড কিছুতেই তার দোষ স্বীকার করছে না। বলছে আমায় এভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে আমি এর জন্য মানহানির মামলা করবো। আমার লইয়ার বন্ধু আছে, আমায় না ছাড়লে আমি তাকে ফোন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। তারপর তরুণ অফিসার টমসনকে বলে–তুমি অন্তত এসব আজেবাজে কথা বিশ্বাস করো না।

–আমি বাধ্য। ওপরওয়ালার নির্দেশ না মানলে আমার চাকরি যেতে পারে। আপনি এরকুল পোয়ারোর নাম শুনেছেন?

-হ্যাঁ, আমার মেয়েরা তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

–সেই আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বলেছেন।

–কিন্তু কেন?

–মিঃ ডিনসমেড আপনি সব দোষ অকপটে স্বীকার করুন। নইলে আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

ডিনসমেড ফ্যাকাসে মুখে জানতে চায়–কী ব্যবস্থা নেবে? টমসন আমি শার্লটকে তোমার সাথে অবাধে মিশতে দিয়েছি আর তুমি...। আমি কিছুই জানি না।

আবার অনুরোধ করেও ডিনসমেড মুখ খুলল না। পরের দিন তাকে আদালতে পাঠানো হল।

দুদিন পরের ঘটনা। কনফেশন রুমে ডিনসমেডের উপর অত্যাচারের পর সে বলে, বলছি আর পারছি না।

পাশের ঘরে পোয়ারো আর চার্লস বসে আছে। চার্লস বলে–এখন আমার ডিনসমেডের কাছে যেতেই লজ্জা করছে।

পোয়ারো বলে–হ্যাঁ তা তো ঠিক–সেদিন তোমায় আশ্রয় না দিলে তো তুমি বাঁচতে না। আর উপরি হিসাবে পেয়েছিলে মেরীর উষ্ণ সান্নিধ্য।

–সত্যি সব মিলিয়ে তুমি মার্ডার করলে।

–আমি না তুমি? আসলে এস. ও. এস. কথাটা আমার মনে সন্দেহের ছায়া ঢুকিয়েছে।

–তাও ঠিক কিন্তু তুমি যে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বার করবে তা কে জানত?

হঠাৎ টমসন এসে বলে–স্যার, মুখ খুলেছে।

–আমি আসছি। পোয়ারো উঠে দাঁড়ায়।

–আমি আসতে পারি?

–হ্যাঁ, পারো।

ওদিকে ডিনসমেড আর অত্যাচার সহ্য করতে পারে না। যন্ত্রণায় সে ছটফট করে। তারপর পোয়ারো আর চার্লসকে দেখে বলে–আপনারা? দয়া করে চলে যান।

টমসন বলে–উনি হলেন এরকুল পোয়ারো।

–মাপ করবেন মিঃ ডিনসমেড।

–এবার বলুন আপনি কী জানেন?

–আ-আমি কিছুই জানি না।

তারপর আরেক দফা অত্যাচারের পর ডিনসমেড মুখ খুলতে বাধ্য হয়।

স্ত্রী মারা যাবার পর রবার্ট দারুণভাবে ভেঙে পড়ে। মেয়ে নিয়ে তার খুব চিন্তা হয়। তারপর সে ভাবে যে সেও আর বেশি দিন বাঁচবে না। তখন মেয়ের কী হবে বলে বন্ধু ডিনসমেড রবার্টকে সান্ত্বনা দেয়।

-না ডিনসমেড আমি ভালো বুঝছি না।

–কেন? তোমার মরে যাবার মতো বয়স হয়নি।

লিজার কি মরে যাবার মতো বয়স হয়েছিল?

–তা ঠিক। তবে তোমার সঙ্গে আমি আছি, অত মুষড়ে পড়ছ কেন?

রবার্ট বলে বিছানায় শুয়ে না ঘুমোতে পারলে যে কী জ্বালা! মনে হয় ভোর না হলেই এখুনি মরে যাবো।

রবার্ট আমার একটা কথা রাখবে?

–কি কথা?

–মিস জুলিয়েটকে বিয়ে করো।

–লিজার জায়গায় আমি কাউকে বসাতে পারি না।

–জানি, কিন্তু সে তো নেই।

–না। ও আছে

–রবার্ট পাগলের মতো কথা বল না। তুমি জুলিয়েটকে বিয়ে করো। দেখবে নতুন জীবন মধুর হবে।

-না। আজ আর তা সম্ভব নয়।

–কেন নয়? মেয়ের কথা ভাববে না?

–সে ভার তো মিস জুলিয়েটের।

এদিকে ডিনসমেড এসেছিল কিছু টাকা ধার করতে। কিন্তু এ অবস্থায় কী করে বলবে? না বললে মেরী, জর্জ এদের অনাহারে রাখতে হবে।

রবার্ট বলে–আমি একটু বেরুবো।

–কোথায়?

দরকার আছে।

–তা যাবে কার কাছে?

-বললাম তো একটু দরকার আছে। রবার্টকে দেখে বন্ধু কষ্ট পায়। তাই বলে–তুমিও চলো। তোমার হাতে সময় আছে?

–এখন তো আমার হাতে অফুরন্ত সময়। ডিনসমেড সংসার, ব্যাবসা, বাড়ির খারাপ অবস্থার কথা বলে...রবার্ট একটা অ্যাটাচি আনছে দেখে–এটা নিয়ে কোথায় যাবে? কী আছে এতে?

লিজার দাদার কাছে। এতে শেয়ারের কাগজ আছে।

-শেয়ার? ডিনসমেডের বিশ্বাস হয় না। কারণ রবার্ট বরাবরই শেয়ারের ব্যাপারে এড়িয়ে যেত তাই এটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

–হ্যাঁ চলো বেরিয়ে পড়ি।

তারপর মিনিট দশেকের মধ্যেই ওরা বার্জের বাড়িতে পৌঁছায়। বয়স ষাট পেরিয়েছে। আগে সলিসিটার ছিল এখন খালি বইপত্র নাড়াচাড়া করে মাত্র। বার্জ ব্যাচেলার মানুষ তাই চারিদিকে একটা অগোছালো ভাব!

রবার্ট ডিনসমেডকে বলে তুমি একটু বৈঠকখানার ঘরে বস, আমরা কয়েকটা কথা সেরেনি। ডিনসমেড ভেবে কূল পায় না। যে রবার্ট তাকে সামান্য কথাও না বলে থাকতে পারে না আজ সে কেন এমন গোপন করছে। বৈঠকখানার লাগোয়া ঘরেই বার্জের স্টাডিরুম।

–এসো রবার্ট আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

-হ্যাঁ, একটু বিশেষ দরকারেই এসেছি। এই অ্যাটাচিতে আমার জীবনের যথাসর্বস্ব লাখ তিনেক টাকা আর দু-লাখ টাকার গহনা আছে আর উইল আছে। এগুলো আপনার কাছে রাখুন আর মেরী সাবালিকা হলে তাকে দেবেন।

-কিন্তু আমি কেন? আমার তো কেউ নেই।

-তাই জন্যই তো আপনার কাছে রাখছি। আপনি নির্লোভ। চার্চের কাছে সব দান করে দরিদ্রের মতো থাকেন। আমার শারীরিক অবস্থা ভালো না। যেকোনো মুহূর্তে...

-না ওভাবে বলা না।

–আর আপনার কাছে রাখার অর্থ হল কেউ কিছু জানবে না। আর জানলে টাকার লোভে... আজ উঠি।

-তা অবশ্য ঠিক।

–চলি।

এসো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ওদের কথা ডিনসমেড আড়াল থেকে শুনে ভাবতে লাগল-রবার্ট তার সাথে এমন ব্যবহার কেন করল?

সারা রাত ডিনসমেড ঘুমতে পারে না। চোখের সামনে অ্যাটাচিটা ভেসে ওঠে। মনে মনে সঙ্কল্প করে ওটা তার চাই-ই। সকালে উঠে সুসানকে ডাকে। সুসান কিচেনে কাজ করছিল, তাড়াতাড়ি আসতে বলায় কাজ ফেলে চলে আসে।

-কী বলছ?

–আজ থেকে মেয়েকে সোফিয়া বলে ডাকবে না। আর জর্জকে বারণ করবে।

–কেন নামটা তো তুমি দিয়েছিলে?

–হ্যাঁ, তবে বড্ড বড় নাম।

–কী নামে ডাকব?

–মেরী। ছোট্ট দুঅক্ষরের।

–কিন্তু বড্ড কমন।

–তা হোক।

সুসান তার কথায় সায় দিয়ে চলে যায়। ডিনসমেড অ্যাটাচিটার কথা ভাবতে থাকে তারপর বার্জের বাড়ির চারদিকে ঘুরে দেখে। কোথা দিয়ে ঢুকবে তারও ছক করে নেয়।

একরাতে ডিনসমেড পাঁচিল টপকে সেখানে গিয়ে দেখে অদূরে একটা বুলডগ বাঁধা। প্রাণের ভয়ে ডিনসমেড যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনই পাঁচিল টপকে বাইরে চলে যায়। তারপর অন্য মতলব আঁটে।

ডিকি নামে একটা লোকের সাথে ডিনসমেডের আলাপ ছিল। সে সার্কাসে বাঘের খেলা দেখাত। বয়স বাড়ার সাথে সাথে চাকরি চলে যায় তবুও তার গায়ে অসুরের জোর। তাকে ডিনসমেড সাড়ে তিন হাজার টাকায় রাজী করায় আর ধার দেনা করে অ্যাডভান্স পাঁচশো টাকা দেয়।

কিন্তু পরদিন সকালে দেখে কুকুরটা তার দেহ ছিঁড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। এতে বার্জ সজাগ হয়ে যায়। তখন কুকুরের সঙ্গে একটা পঁচিশ বছরের যুবককেও তার হাতে রাইফেল দিয়ে পাহারায় লাগিয়ে দেয়।

ডিনসমেড স্থির করে সে বন্ধুকে হত্যা করবে, তাই স্থির করে যায় রবার্টের বাড়ি। শোনে সে নর্থ রোডে যাবে পরের দিন। এই সুযোগে আগে গিয়ে স্টেশনে বসে ডিনসমেড। বৃষ্টি পড়ায় ট্রেন ফাঁকা। যথারীতি রবার্ট আসে। ডিনসমেড তাকে দেখে একটা কামরায় উঠে যায়। তার পাশের কামরায় বসে রবার্ট। রবার্ট গাড়িতে বসে ঝিমোতে থাকে আর সেই ফাঁকে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, চোখে সানগ্লাস, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ডিনসমেড সে কামরায় আসে। তাকে যেন অশরীরী আত্মা ভর করেছে। নর্থ রোড ছেড়ে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দরজার কাছ দাঁড়ায় রবার্ট। নামবে কী না ভাবছে, ডিনসমেড তাকে তখনই ধাক্কা দেয়।

তারপরেই আবার একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে একটা ভিড় কামরায় বসে চলে যায় অফিসে। তারপর জোন্স-এর ফোন আসে। তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে জুলিয়েটকে জানাতে বলে।

পরদিন রবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ডিনসমেডকে সকলে প্রকৃত বন্ধু বলতে লাগল। মেয়ের ভারও আমাকেই নিতে বলল। ডিনসমেড গেল বার্জের কাছে। সেও ডিনসমেডকে ভালো বলেই মনে করল। মেয়েকেও নিজের কাছে নিয়ে রাখতে বলল।

বার্জ জানায় জোন্সের শিক্ষাদীক্ষা তেমন না, তাই ওর কাছে মেয়েকে কিছুতেই রাখতে দেওয়া হবে না। তোমার কাছে মেয়েকে রাখতে হবে। ডিনসমেডের ইচ্ছা সফল হল।

এদিকে জোন্স ডিনসমেডকে মেয়ে দিতে রাজী হল না। পিটার এর মধ্যে গ্রীন উডে একটা বাড়ি ঠিক করে, পঞ্চাশ হাজার টাকায়। কিন্তু অত টাকা পাওয়া মুশকিল। এদিকে রজার বাড়ি ছাড়ার জন্য তাড়া দেয়। এই সুযোগে তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা চায় ডিনসমেড। বলে এই টাকা দিলেই সে বাড়ি খালি করে দেবে।

প্রথমে রজার তা দিতে রাজী হয় না। কিন্তু তাকে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে ডিনসমেড। মাটির তলা থেকে একটা পুরোনো প্যাকেট থেকে কোকেন বের করে তাতে রজারের নাম ঠিকানা দেখায় ডিনসমেড, বলে পুলিশকেও জানাবে।

তারপর রজার তাকে টাকাটা দেয় আর দুজনের মধ্যে কথা হয় এই টাকার কথা কেউ জানবে না। আর রজারের ব্যাবসার কথাও গোপন থাকে। রজার যাবার পর পিটারকে ডিনসমেড বলে মাত্র চল্লিশ হাজার হয়েছে পরে আরো তিন হাজারে রফা।

দশ বছর কেটে যায়। সোফিয়া ছয় বছর মেরী দশ। আসল মেরীর নাম রাখা হয়েছিল শার্লট। তার বয়স সাড়ে আট। সে তাদেরই বাবা-মা বলে জানে।

তখন থেকেই শার্লট, জর্জ আর মেরীকে নিয়ে সে ঘুরপথে বার্জের বাড়ি যেত। মুখে বলত আমার দুই মেয়ে কিন্তু আসলে মেরী সাজিয়ে নিজের মেয়েকে নিয়ে গিয়ে রবার্টের সম্পত্তি গ্রহণ করতে চাইতো।

হঠাৎ যীশুর দিকে তাকিয়ে চোখে জলে ভর্তি করে ফেলত। তাই দেখে বার্জ তাকে খুব ভালো মানুষ বলে মনে করতে লাগল। সত্যিই সে এমন দৃষ্টান্ত কম দেখেছে।

মেরীর সাথে গল্প করে বার্জ জানতে পারে সে ডিনসমেড আর তার স্ত্রীকেই বাবা-মা বলে জানে। এ দেখে সে আরো খুশী হয়। ডিনসমেড তাকে বলে সেই তো একদিন জানবেই। তাই আগে থেকে দুঃখ দেবো কেন? বড়ো হোক তখন নিজেই জানবে।

এদিকে শার্লট বড়ো হচ্ছে তাকেও পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। না হলে সে যদি বড়ো হয়ে জানতে পারে তবে তো আর রক্ষে নেই এতে। এতদিনের পরিকল্পনা একবারে মাটি হয়ে যাবে। তাই শার্লটের জুতোর পেরেকে আর্সেনিক লাগিয়ে তাকে স্লো পয়জন করতে থাকে।

বার্টের বন্ধু ল্যাবোরেটরিতে কাজ করত তার কাছ থেকেই ভয় দেখিয়ে আর্সেনিক আনত। তাই নিস্তেজ হয়ে গেছে শার্লট। তাকে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। সে এখন ভালো আছে।

সবশেষে যখন ডিনসমেড স্বীকার করে তখন সে মুখ থুবড়ে টেবিলের উপর পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

তখন পোয়ারো তরুণ অফিসার টমসনকে বলে–ডিনসমেড দোষী, তার তত শাস্তি হবেই কিন্তু শার্লট কোনো দোষ করেনি, সে কিছু টাকার উত্তরাধিকারিণী হয়েছে। আমি চাই তুমি ওকে বিয়ে কর। আর দেখ ঐ সংসার যেন ভেসে না যায়। আমার এই অনুরোধ তুমি রেখো।

–অনুরোধ না, স্যার আদেশ বলুন। আপনি না থাকলে এ কেসের সমাধান হত না।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চার্লস আর পোয়ারো গাড়ি করে চলে যায়। যেতে যেতে পোয়ারো বলে–এই ব্যাচেলার জীবনই ভালো। দ্যাটস লাইফ ইজ গুড।